শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৫

কবিতা

ছোট

কবিতা

বাংলা ছোটগল্প

ছোটগল্প ও সমালোচনার নিয়মিত ত্রৈমাসিক
অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৮ । সূচীপত্র

P 30283

গল্প

সন্তোষকুমার ঘোষ । অতন্দ্রর দিন । ৯
অনিকা সরকার । শরীরী । ১৬
রাধানাথ মণ্ডল । এই থাকা, এই অমিতাভ । ২১
কল্যাণ সেন । সাইলেন্স ! সাইলেন্স । ২৪
কালীকুমার চক্রবর্তী । আরেক বাঁচা । ২৮
তপন বন্দ্যোপাধ্যায় । আশ্রয় । ৩২
স্বদেশরঞ্জন দত্ত । চাবুক । ৩৫
জহর সেনগুপ্ত । ছলমলিয়ার মূলধন । ৪৩
দিলীপ ঘোষ । তৃতীয় নয়ন । ৪৬
মহাশ্বেতা দেবী । সাপ । ৫০
পূর্ণেন্দু পত্রী । কর্কট রাশি, বৃষলগ্ন । ৫৬
অময় রায়চৌধুরী । মা, অথবা আমার সুমিতা । ৬৫
নবকুমার বসু । ভ্রান্তি নেই । ৬৯
সুব্রত সেনগুপ্ত । অবিনাশ কি করবে । ৭৩
দিলীপ সেন । প্রতিভা । ৭৭
কামাল হোসেন । প্রচ্ছন্ন নিষাদ । ৭৯

সম্পাদকীয় । ৮৬

প্রচ্ছদ । পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক । স্বদেশরঞ্জন দত্ত সহযোগী সম্পাদক । অময় রায়চৌধুরী

কার্যালয় । ১৮ পদ্মপুকুর রোড । ভবানীপুর । কলকাতা ২০ । দাম দু'টাকা

চাষীর ঘরে
আজ খুশীর জোয়ার

নতুন ধানে নবান্ন হয়েছে সারা। সময় নেই। মাঠে শুরু হয়েছে আবার নতুন ফসল বোনার কাজ। আধুনিক প্রথায় চাষের ফলে আজকের চাষী আগের থেকে অনেক বেশী ফসল ঘরে তুলছে। তাইতো আজ তার ঘরে এসেছে খুশীর জোয়ার। উন্নত প্রথায় চাষের কাজে চাষীর পাশে আমরা এগিয়ে এসেছি।

পূর্বভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, অরুণাচল, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর, আন্দামান, নিকোবর এবং সিকিম ও ভূটান এক বিস্তৃত অঞ্চলে **আমরা চাষীর সেবায় নেমেছি।**

শুধু সার সরবরাহ নয়, উন্নত চাষে চাষীকে শুরু থেকে শেষ সহায়তাই আমাদের কাজ

হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড
(বিপণন বিভাগ)
৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—৭০০০৭১

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন ঃ

কি ভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির মোকাবিলা করবেন।

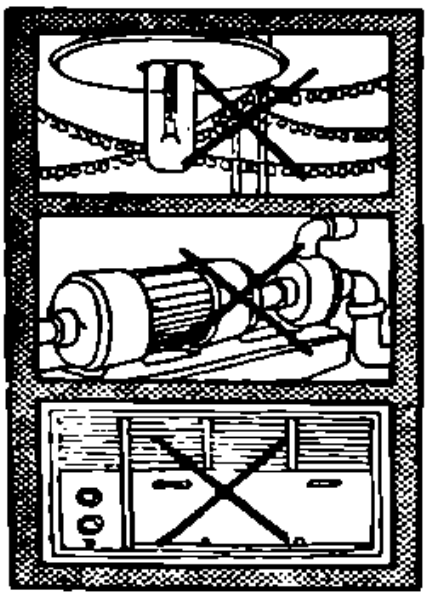

খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কী ভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাই ভালো।

কী ভাবে মোকাবিলা করবেন ঃ

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর ব্যাপারে এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের ঘরও কমান। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জলের পাম্প, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আইন মেনে চলুন ঃ

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি পালন করতে মনে রাখবেন। সকাল ৯-৩০ থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকন্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ন, মার্কারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাতি জ্বালানোও নিষেধ।

'বিদ্যুৎ' ঘাটতি কমিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

SEB 459A3/77

বাস্তবের মুখোমুখি

সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার ক্ষেত্রে প্রাক স্বাধীনতা যুগে যে শহর কলকাতা সমগ্র ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের ঔদাসীন্য ও অবহেলায় চারদিক থেকে স্তূপীকৃত নৈরাজ্য তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে।

এই শহরের সমস্যা চিত্র যেমন বিশাল তেমনি ভয়াবহ। আলো বাতাসহীন অন্ধকার নোংরা ঘিঞ্জিবস্তি, খোলা নর্দমা, খাটা পায়খানা, স্তূপীকৃত আবর্জনা, রাতে মশা দিনে মাছি, পথ-কুকুর, ছাড়া গরু। পানীয় জলের অভাব, ফুটপাতের বাসিন্দা, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট ট্রাফিক জাম, হুকারি, মস্তানি, গুণ্ডামী, ভেজাল খাবার ভেজাল ওষুধ, মদের চোরাকারবার, জুয়া, অপসংস্কৃতি সব মিলিয়ে আমাদের টানে এক অতলান্ত গহ্বরের দিকে।

কিন্তু তবু এই কলকাতায় নৈরাজ্যের অন্ধকারের মধ্যেকেই জীবনের শত সহস্র আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়ে। খেলার মাঠে, ময়দানের সভায়, পথে পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আশাবাদী মানুষ, সরকার যদি উদ্যোগী হয় তাহলে মানুষ ধৈর্য ধরতে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত। তাই আমাদের আবেদন :

১। জলের অপচয় করবেন না। কলের মুখ খোলা দেখলে বন্ধ করে দেবেন।

২। নির্দিষ্ট পাত্রে ছাড়া রাস্তায় কোথাও জঞ্জাল ফেলবেন না।

৩। রাস্তার বাতিস্তম্ভ থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি ঘৃণ্য অপরাধ।

৪। দেওয়ালে কুৎসিৎ কিছু লিখবেন না।

৫। ফুটপাথ পথচারীদের, এখানে কায়েমী স্বত্ব গড়ে তুলবেন না।

৬। রাজস্ব আদায় সমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি—কর বাকি ফেলবেন না।

৭। ভেজালকারীদের চিহ্নিত করে সংগঠিতভাবে তার শাস্তি দাবি করুন।

গঠনমূলক সমালোচনা এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করবে।

কলকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত।

উৎসবের সময়

"খাদি ও গ্রামোদ্যোগজাত শিল্পবস্তু ক্রয় করলে হাজার হাজার দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পীকে সহায়তা করা হবে, তাদের কাজ উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে, তার ফলে গ্রামীণ শিল্প সামগ্রিকভাবে আরও উন্নত হবে।"

জ্যোতি বসু
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

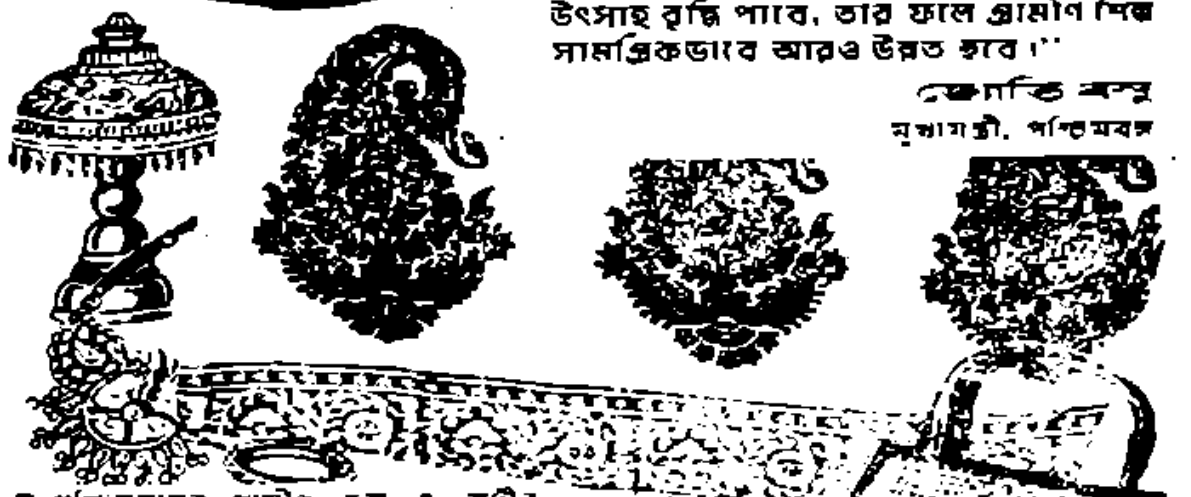

- পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বস্ত্র ও কুটীর শিল্পসম্ভার যথেষ্ট উন্নত ও আকর্ষণীয়।
- দামের দিক থেকেও এগুলি তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীদের সহায়তার জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন।

গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য

খাদি ও গ্রামীণ শিল্পবস্তু ক্রয় করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

HINDUSTAN MOTORS LIMITED

Manufacturers of :

AMBASSADOR CAR, TRUCK,
TREKKER AND HEAVY EARTHMOVING
EQUIPMENTS

Regd. Office :

9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-700001

Factories at :

HIND MOTOR (West Bengal)
AND
TRIVELLORE (Tamil Nadu)

পূজোয় চাই নতুন জুতো

খোকার জুতো খুকুর জুতো
বাবার জুতো মায়ের জুতো
সবার জন্যে বাটার জুতো

লিলিপুট ১৭
সাইজ ৩-৮
টা ১৭.৯০

Bata

অফিসেটা ০৭
সাইজ ৩-৭
টা ২১.৯৫

ফিয়োনা ১২
সাইজ ৩-৭
টা ৩৯.৯৫

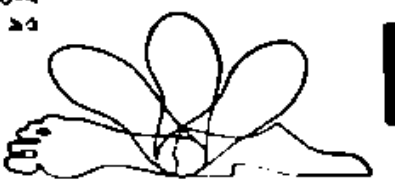

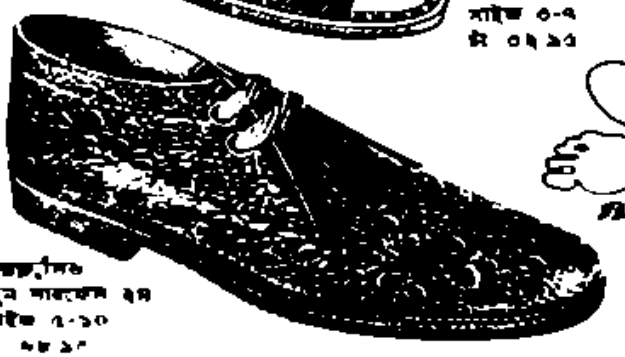

এয়ারহোস্ট
ব্লু সাটেলেদ ২৭
সাইজ ৭-১০
টা ৯৮.৯৫

ছন্দ
সমন্বয়
গড়ে ওঠে
যৌথ
প্রচেষ্টায়

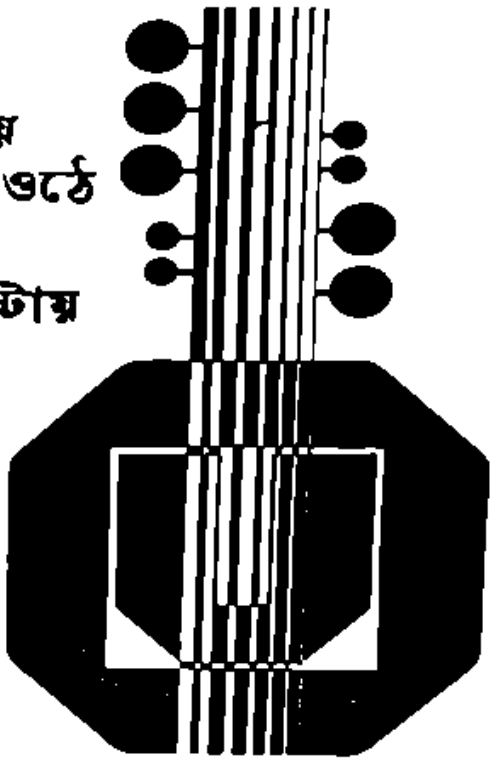

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণের ব্যাঙ্কশ্রী
কর তুলতে সাহায্য করছে

৪৫৫৫-৮৮ BM

অতনুর দিন

সন্তোষকুমার ঘোষ

কী অদ্ভুত ব্যাপার, আমরা খালি আমরাই থাকি কখনও আমি হই না। কী অদ্ভুত ব্যাপার আমরা চলে যেতে চাই, অথচ খচ্‌খচ্‌ থাকি। এই থাকাটাই খোঁচা মারে আমাদের শব্দে শব্দে, কথায় কথায় চালিয়াতি করে দেয়। ফলে আমরা না থাকি, না পারি চলে যেতে। যাইও না, থাকিও না।

এ সব কী বলছি; একটা গল্প বলবো বলে অঙ্গীকৃত হয়েছিলাম। তার খেলাপ হচ্ছে। অঙ্গীকার বাকচাতুরীর অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে।

মরীয়া হয়ে তবে একটা গল্পই বলতে চেষ্টা করি। গল্প তো নিজে নিজে হয় না, গল্পকে কৌশলে দাঁড়াতে হয়। প্রত্যেকটা গল্প আসলে টেস্ট-টিউব বেবি। কোনও গল্প কেচ্ছা, কোনোটা কাহিনী আর বিরল কিছু কিছুর নমুনা কেবলই কথা। যেমন এই লেখাটা।

বেশ, কথা তো কথাই সই। অতঃ কথারম্ভ।

অতনু একদিন সকালে উঠল। প্রথমে চোখ কচলে আলো এসেছে কি আসেনি সেটা কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে ঝাপসা পরখ করলো। পরনের পা জামাটা ঢিলে হয়েছিল, গিটটা কষে আটকে সে বাথরুমে গেল। সেখানে প্রাতঃকৃত্য করতে করতে তার মনে হল মনের যদি এই রকম কোন প্রস্রবণ, কোন মলদ্বার থাকতো? মনের ওপরে শরীরের এইখানেই জিৎ, বাইরেটা ভিতরের ওপর টেক্কা মারে। শরীর খোলসা হয়, নিষ্কৃতিতেই মুক্তি পায়, মন পায় না। তার কোনও খালাস হবার ব্যাপারই নেই। যদি না সে কোনও ছবি আঁকে, কদাপি একাকী গান গায়, আর কাগজের ওপর কলমকে উপগত করে হিজিবিজি যা খুশি তাই লেখে।

সে আর ক'জন পারে। সবাই যা পারে অতনু সেটাকেই স্মরণ করল। সবাই অন্তত সশরীরে বমি করতে পারে। যেন ভিতরটাকে বাহির করে দেওয়া। সেতো শারীরিক ক্রিয়া। তারপরেও (গালে সাবানের ফেনা ঘন করতে করতে অতনু ভাবলো) যা গুহায় তা গুহার অভ্যন্তরেই নিহিত থাকে। যা বাইরের সেটা খালি বাইরের জিনিসকেই বের করে দেয়। ভিতরের বস্তু ব্যাঙ্কের লকে লুকোনো কালো টাকার মতো, অথবা লক্-আপের কয়েদির

মতো বন্দী আর অন্ধকারে বন্ধই থাকে। যে অন্তর অভাস্তর, সে আলো দেখতে পায় না—এই সতো উপবিষ্ট হয়ে অতনু সেদিন আরো নির্ভুল হাতে, প্রকাণ্ড আয়নাটাই তার চিন্তার প্রতিচ্ছবি, চকচকে কাঁচটাকে এইভাবে চিনে নিপুণ হাতে সেফটি রেজার চালিয়ে গেল।

এইভাবেই গল্পের শুরু, দিনের শুরু। অতনু যদি একটা গল্প হয় তবেই।

স্নান সারা। অতনু বেরিয়ে এলো একটা তোয়ালে জড়িয়ে। প্রবেশ করলো তার পা-জামায়। গলায় ছড়ালো অকাতর পাউডার। শোবার ঘরের আয়নাটা খুব লম্বা। সেইটাকে সাক্ষী রেখে অতনু তার ক্রম-বিরল চুলের বয়স্কতার প্রান্তরে চিরুনি চালালো।

সুন্দর হতে হবে। সুন্দর যদি হওয়া নাও যায় সুন্দর দেখানো চাই। সামাজিক সর্ত বাইরেটাকে ঝকঝকে রাখা, মানুষের—কী পুরুষের কী মেয়েদের ভিতরের চিরকালের ইচ্ছা বাসনা আর লোভ।

তখনই একটা টেলিফোন ক্রিং ক্রিং বেজে উঠতে পারতো। রিসিভারটা কানে নিয়ে অতনু বলতে পারতো কে সুমিতা? এতো ভোরে ফোন করলে যে?

তোর কোথায়? বাঃ মোটে তো সকাল সাড়ে আটটা, এটা তোর নয়? প্রথম কাক কখন ডেকেছে জানো? আরে আরে কাকেদের কথা ছেড়ে দাও—ওদের তো সে রকম হেভি নাইট যায় না! তাই ওদের সকাল খুব সকালেই হয়। বড্ড কায়দা করে বলছ। আমি যে তোমাকে ফোন করলাম তোমার ভালো লাগছেনা? লাগছে লাগছে, না লাগলে তো কখন ফোনটা রেখে দিতাম, ইংরিজিতে হ্যাংআপ্ করা যাকে বলে। বলো, তুমি বলো আর আমি শুনি।

একই টেলিফোন তাই কোনটা কার কথা সেটা আমি, এই লেখক, আর স্পষ্ট করে লিখলাম না। সব জড়িয়ে গেল, জড়িয়ে দিলাম।

ফোনের ওই দিক থেকে তখনও একটা সুরেলা গলা ভেসে আসছে, আচ্ছা তোমাদের পাড়ায় এখন কি বৃষ্টি হচ্ছে? অতনু বললো, না।

—মেঘ জমেছে?

—জমেছিল, এখন তোমার গলার আলো আর হাওয়ায় কেটে যাচ্ছে।

—দারুণ, দারুণ বানিয়ে বলতে পারো তুমি।

—অতনু, তোমার সবটাই বানানো নয়তো?

—একথা বলছো কেন? অতনু আহত গলায় বললো।

—কী জানি আমার ভয় হয়। এতো যে বানায়, সে হয়তো আসল কথা কখনো বলে না। তোমাকে নিয়ে সেই ভয়।

চুলে আরেকবার ব্রাশটা বুলোতে বুলোতে অতনু টেলিফোনে মুখ রেখে মেঘের মতো গাঢ় হয়ে বললো, সুমিতা আমাকে নিয়ে আমারও যে বেজায় ভয়।

দুর, দুর, আপনাদের ঠকাচ্ছি। এসব কথা কিছুই হয়নি। কোন টেলিফোন বাজে নি। টেলিফোনের ওই স্বভাব। যখন না বাজবার তখন বাজে আর যখন ঝনঝন বেজে উঠুক এইটেই চাই, তখন ঠাণ্ডা; চুপ মেরে থাকে। যদি ফোনটা বাজতো, তবে?

তোমার মনে সেবার দারুণ ভালিয়া তো হয়েছিল, এটা তো ভালিয়ার সময় নয় সুমিতা, এটা শরৎ। এখন খালি শিউলি। আর আর অনেক দূরে বাস বাস কাশ। নদীর ধারে। যদি নদীর পারে যেতে পারি। আমাদের রোজকার বাঁচায় কোনখানে নদী নেই সুমিতা। থাকলেও তাকে দেখি নাই, কখনো দেখি না।

ওই দিক থেকে (এটা জমাটি গল্প হলে) তখন হাল্কা একটা হাসি শোনা যেতেও পারতো। সেই হাসিতে জানালার বাইরে বাতাস, উপরের লাজুক নীল ঘোমটা পড়া আকাশ, বাগানের শিউলি-টিউলি সব একদম মিথ্যে হয়ে যেত।

কিন্তু আসল কথাটা এই ততক্ষণে অতনু পাজামা থেকে কড়া-ক্রিজ্ প্যাণ্টালুনে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। গলায় বেঁধেছে রঙচঙে টাই। চাপিয়েছে কোট। পায়ে নির্ভুল মোজা। দেখতে পাচ্ছি সে এখন চকচকে জুতোটার ফিতে বাঁধছে।

একটু বাদেই সে বেকন আর টোস্ট, ডিম আর কফি সহযোগে প্রাতরাশ সারবে। তুড়ি দিয়ে ডাকবে তার অনুগত মৃত্যুকে। গ্যারাজ থেকে গাড়ি বেরোবে। ঘরের এয়ার কুলারটার সুইচ অফ করে দিয়ে লিফটের বোতাম টিপবে অতনু। উর্দি পরা শোফার তাকে সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দেবে।

তারপর, তারপর? এই মহা-শহরের ছোট-মেজ-বড় সড়কে জন আর যানের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সুতো যে ভাবে সুচের ভিতর দিয়ে গলে যায় সেইভাবে গলে যাবে অতনু, তার অফিসে উপনীত হবে।

আবার সেলাম। দারোয়ানদের, লিফটম্যানের।

এ কি তার কর্মস্থল না ঘর্মস্থল? এ কি তার অফিস না হাড়িকাঠ? এখানে সে রোজ বলি হয়, মরে, আবার বাঁচে! নিদেন বেঁচেছে বলে ভাবে।

ফাইলের পর ফাইল, সইয়ের পর সই। আহা, সইটাও যদি ডিকটেশান দেওয়া যেতো! যেভাবে সে গড় গড় করে চিঠির পর চিঠি আউড়ে যায় সেইভাবে? সে বলে, কেউ লেখে।

তারপরে এতোক্ষণ যতো সেলাম নিয়েছে, সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। ইন্টারকম যেন রেল কাম ঝমাকম। বাজে বাজে বাজে। খালি যে বেজে ওঠে তাই নয়, একদম বাজে। বরদাস্ত হয় না। টাইটা আলগা করে দিতে সাধ হয়। জুতোর ফিতেটা খুললেও ভালো হতো, কিন্তু সে যে বিচ্ছিরি, বড় নিচু হওয়া। ঘাড়ে গর্দানে চর্বি জমেছে তো। আজকাল বড় লাগে। ঘাড়ের চেয়ে বেশি ক'রে বুকে।

ইন্টারকম ঝমঝম। ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার। ইন এ মোমেণ্ট স্যার। স্যারটেন্‌লি। আই উড সি দ্যাট দিস ইজ্ ডান। আগে হয়নি সেটা আমার দোষ। দি ফল্‌ট্ ইজ মাইন। এক্স্‌কিউজ মি।

এইভাবে কথা বলতে বলতে কতোবার যে অলক্ষ্য প্রভুকে সম্মুখে দণ্ডায়মান কল্পনা করে কতোবার উঠে দাঁড়ানো, কতোবার যে গালে কপালে বোকা বোকা রুমাল ঘষা। যেন ঘষলেই সব লজ্জা মুছে যাবে. যেন উঠে দাঁড়ালেই বিধাতা-প্রতিম নিয়োগ-কর্তাকে যথাবিহিত সম্মান দেখানো হবে, একটি কুশ অথচ কোন লব নেই, ফাঁকা ঘরে একটা নাটক, বিনয়াবত অতনু বারবার সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়।

তার শোধ সে তোলে। প্রথমে বিজলি ঘন্টি টিপে বেয়ারাকে বলা, উল্লু, তুম ইতনে তক কাঁহা থা?

বেয়ারা তোতলামি করে কি বলে, সে তা কানেও তোলে না, তার ভিতরের মন তুলতেও চায় না।

ধরা গলায় অতনু তখন অনাবশ্যক এক গ্লাস জল চায়।

এই ঘরেও একটা কাঁচের জানলা আছে ভাগ্যিস! জানলাটা খুলতেই গোটা আকাশ আর বাইরের রাস্তা তাদের সব নীল আর সব ধুলো আর আওয়াজ নিয়ে কামরাটায় হুড়মুড় ঢুকে পড়ে। আকাশ তোমাকে ঠেকাই আমার সাধ্য কী? তোমার নীলটা ভীষণ কালো। আর রাস্তার সব ধুলো বড় নোংরা বড় দম বন্ধ, বড় ছাইছাই।

তখন সই করতে করতে, ওনাদের সেলাম দিতে দিতে আর এদের ধমকাতে ধমকাতে হয়রান অতনু গ্লাসটপ টেবিলে পাইপটা ঠকঠক ঠোকে। স্বরভিত মিক্‌শচার ঠেসে পুরে দাঁতে দাঁত চেপে গ্যাস লাইটারটা জেলে মনে মনে নিজেকেই

বলে আমার মুখাগ্নি আমি নিজেই করলাম।

তখনই মনে পড়ে সন্তান নেই। বিল্টু ছিল। মনীষা তাকে নিয়ে কবে যে উধাও হল। রাগে অভিমানে, আক্রোশে প্রতিশোধে প্রস্থান করলো তার জীবন থেকে।

বিল্টু এখন কতো বড় আর মনীষা কতো বুড়ি হয়েছে কে জানে। ডেস্ক-ক্যালেণ্ডারে তার হিসেব হদিশ নেই। খালি একটা চলে যাওয়া ইস্কুলের ছুটির শেষ ঘণ্টার মতো বুকের উপরে হাতুড়ি পিটছে। ঢং ঢং শব্দটা এক চুমুক জলের সঙ্গে অতনু গলাধঃকরণ করলো।

কাজ আছে, আর কাজ নেই। তার কাজ নেই। জীবনের কাজ নেই আর তাকে নিয়ে। এবার অতনু বেরোবে। এই বাতানুকূল কামরাটা হঠাৎ যেন প্রতিকূল হয়ে উঠছে। আজকাল প্রায়ই ওঠে।

সে ভাবে একটু ফষ্টিনষ্টি করা যাক না কেন। আচ্ছা আমার ঘরে তো তিন-চারটা টেলিফোন যদি কাউকে ডাকি? হাসি মশকরা করি? কাকে? কার সঙ্গে? সুমিতাকে? যাঃ, তা আর হয় না। সে তো সকালেই হয়ে গেছে। সকালটা যদি সুমিতার, তবে বিকালের কে?

এখন নিজের কাছে নিজে অসহ্য, কাকে ডাকবে অতনু? কোন নম্বর ডায়েল করবে? নীলার, না প্রতিমার? এই জিজ্ঞাসা চিহ্নগুলো বৃষ্টির তীরের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসে তাকে বিদ্ধ করতে থাকলো, তাকে ভিজিয়ে দিল। সেই বৃষ্টির জলের নাম রক্ত।

রাগে অনুরাগে অন্ধ হয়ে জানলাটা জোর বন্ধ করে দিল অতনু। কী বলবে, কী বলবে সে? তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে? রোজ তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে? চিরকাল যতো পুরুষ চিরকালের যত মেয়েকে মুখস্থ মামুলি যতো কথা বলেছে সেই সব কথা? সেই সব সত্য আর সেই সব মিথ্যে? তাদের আসা মানে তো ভ্যানিটি ব্যাগ, আর সারা কামরা সেন্টের মিষ্টি ছড়িয়ে যাওয়া?

তাছাড়া হাজার ডাকলেও মনীষা তো আর আসবে না! সে এখন কার সঙ্গে চলে ফেরে ওঠে বসে শোয়, কিছু জানে না অতনু, কিছু জানে না। বিল্টুকে সে কোনোদিন আর চোখের দেখাও দেখবে কিনা সন্দেহ। মনীষা তো তার শেষ মনি অর্ডারটা ফিরিয়ে দিয়েছে।

মনীষার বিকল্প তবে কি নীলা প্রতিমা সুমিতা আর জয়তী? আর আর আর

আরো কতো। একদিনের দুদিনের, একমাসের ছমাসের, বড় জোর বছর কয়েকের।

ভাবতে ভাবতেই উত্তেজিত হলো অতনু। টেলিফোনে ডাকতেই বা হবে কেন? না ডাকলেই আসে এমন কেউ কি নেই? সব নেই কেন? খুট খুট খুর পরা জুতো পরে এই ঘরে ঢোকে তৈরি-করা গলায়, আগে থেকে তৈরী আর তালিম দেওয়া কথা বক বকম করে।

যারা খালি পায়ে হাঁটে তারা কি আজকাল একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে? থাকলে কিন্তু বেশ লাগতো। এই কারপেটে মোড়া ঘরে যেমন ঘাসে তেমনি এখানে খোলা পায়ে কোন শব্দ হতো না। অথবা, যদিবা হতো সে শুধু ঢেউয়ের শব্দ। একেবারে হৃদয়ের গভীরে। ছলাৎ ছলাৎ।

খালি পায়ের শব্দ ভীষণ আওয়াজে বাজে।

আর পারলো না অতনু। ঠেকলো গিয়ে একটা পানশালায়। মরাদের যেমন শ্মশান, তথাকথিত অ্যান্তদের জন্য তেমনই এই সব সরাইখানা সরাবখানা।

ফরমাস দিল, চুমুক দিল, দিতে থাকল। গ্লাসের পর গ্লাস। সে জীবন্ত না সে লাস?

একটা গ্লাসকে সে নাম দিল নীলা, একটাকে বললো প্রতিমা, এইভাবে এইভাবে একটার পর একটা। চুমুকের পর চুমুক। চুমুর পর চুমু। শেষ গ্লাসটা কাঁপা হাত থেকে পিছলে যাচ্ছিল, সেটাকে শক্ত করে আঁকড়ে তার কানে কানে অতনু, বললো, মনীষা আমার মনীষা।

তখনই তার বাড়ির বাইরের বাগানে যে নাগকেশরটা সকালে দেখে এসেছিল সেটা চোখে ভেসে উঠলো। ওকি বিন্টু?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো অতনু। মিটিয়ে দিল সরাইখানার যা কিছু পাওনা। সটান হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠলো। সিট্-এ হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে বললো, এই পানশালাটা যেন পৃথিবী। সমস্ত মিটিয়ে দিয়ে এলাম। এই পৃথিবীর কাছ থেকে যেদিন চলে যাব সেদিনও যেন এইভাবে না টলে কারো কাঁধে হাত না রেখে টান টান হেঁটে যেতে পারি।

ততক্ষণ বেলাটা হলদে হয়ে গেছে। যখন অতনুর গাড়ি বাড়ির ফটকে গিয়ে দাঁড়ালো ততক্ষণে চারধার লোহা, চারাঘর কালো। সে খুঁজলো, বাগানে একবার দাঁড়ালো, কিন্তু সকালের নাগকেশরটিকে সন্ধ্যাকালে আর দেখতে পেল না। মিলে গেছে, মিশে গেছে, মরে আছে।

অতনু অসহায়, একবার আকাশের দিকে তাকালো। রোজ যে তারাটা রূপোর মতো জ্বল জ্বল করে সেটাই বা কই? সব মেঘে ঢেকে গেছে।

অতনু টাই-বুট কোট্ পরা জবরদস্ত অতনু সেই নেমে আসা ঢেকে যাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদবে বলে একবার রুমাল বের করেছিল, পরে মানাবে না, মানাবে না যেন শো শো বাতাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো।

তারপর একটু স্তব্ধ, এক গেলাস হুইস্কি। এইভাবে একটা দিন শেষ হলো। রোজ যেমন হয়। রোজ যা ঘটে তা কি গল্প? না। জীবনে প্রতিদিনে গল্প নেই বলেই তো গল্প বানাতে হয়। এই ব্যাপারটা তার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরাতে থাকলো বলেই অতনু অবশেষে ফোম্ রাবারের নিত্যকার বিছানায় গা ঢেলে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজলো।

একটা চাপা আওয়াজ তখনও যেন একটা গোঙানির মতো। সে হাসছে না কাঁদছে, আর বোঝা যাচ্ছে না।

আকাশে তখন একটাও তারা নেই, বাগানে একটা ফুলও দেখা যায় না।

শরীরী

কণিকা সরকার

বহুদিন রমলার আর কোন প্রেম নেই।

আগে-আগে সকালে ঘুম ভেঙে তার মন খারাপ হ'তো। কান্না পেতো। এখন অপ্রেমেই অভ্যেস হয়ে গেছে তার।

শরীরের জ্বর-আসা তাপ-তাপ মন বহুদিন কারো স্পর্শ নেয় না আর। অথচ এই শরীর, এই মন একসময় দিনরাত, প্রত্যেকটা মুহূর্তে কেমন ওম-ওম হ'য়ে থাকতো। এই মুখ, মুখের চামড়া, বুকটা কী ভীষণ স্পর্শকাতর ছিলো। সেই দুটো শাদা ধবধবে তিল-সাজা বুক পরিত্যক্ত পাখির বাসার মতো তাই বুকের একেবারে কাছে থেকে গেছে মুঘল আমলের দুর্গের মতো। কত ইতিহাস আছে এই দুটো বুকের। অথচ আজ আর কিছু নেই। কোনো সৈন্য নেই, হঠাৎ আক্রমণ নেই, চৈত্রের ঝড় নেই, বুন্দে-বুন্দে কোন শিহরণ নেই।

এখন এই শাদা চামড়ায় মোড়া দুধের ওপর একমাত্র পাঁচ বছরের একটা বাবা নরম আদরে আর শ্রদ্ধায় মাঝে-মাঝে ঘুরে বেড়ায়। তার মেয়ে বোঁটায় মুখ লাগিয়ে মুখ সরিয়ে নেয় 'জন্মান্তর সৌহৃদ্যনির স্মরণ ফিরে পেয়ে। রমলা মেয়ের মাথায় হাত বুলোয়। বলে, 'তুমি তখন আর কিছু খেতে না, শুধু আমার দুধ জানো?'

'আর কিছু না?'

'হ্যাঁ, আর বোতলে ক'রে ল্যাক্টোজেন··' কথা শেষ হয় না। মন, মনের নিচেতলায় তখন রাগরাগিনী বাজতে শুরু ক'রে দিয়েছে তার। পরিত্যক্ত দুর্গের ইতিহাস তার স্মৃতি নিয়ে মন মাথা শরীরময় বিভিন্ন স্তরে একই বিষন্নতার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

রমলা আর ভাবে না। নিশ্বাস ফেলে বা নিয়ে প্রয়োজনীয় বাস্তব কথাগুলো ও তার জরুরী সমাধানের এক্তা দোক্তায় চ'লে এসেছে সে।

ঐ যে মানুষটা তার দিকে পিছন ফিরে মাটিতে ব'সে কী করছে! ঐ লোকটার কথাই ধরতে গেলে অবাক লাগে তার নিজেকে।

কী আশ্চর্য! ওকে না-হ'লে না-পারায় একদিন দু-জনে সবুজ রঙের পাঁচটা দেওয়ালের গুহায় গিয়ে ঢুকেছিলো তারা আজ থেকে দশ বছর আগে।

দশ বছর কি খুব বেশি সময়? না-ও বটে হ্যাঁ-ও বটে। এই তো মাত্র সেদিন মনে হয়। আর সেদিনটাও কেমন মনে করার জন্যে মনে পড়ে ব'লে কী-রকম ভারি আর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সব চ'লে যায়। আজ আর মানুষটার সঙ্গে তার কোনো আগুন নেই। আজ শুধু মেয়ে। মায়া হ'য়ে সব দুর্গ ম্লান হ'য়ে গেছে। এই বেশ। বাঃ বাঃ। এসব কি কখনো কল্পনাও করতে পেরেছে সে যে মানুষটার সঙ্গে এমন মায়ায়-মায়ায় জড়িয়ে যাবে? মানুষটাও? রাগ আছে, দুঃখ আছে, ক্রোধ আছে, সম্পর্কের মধ্যে। কিন্তু সমস্ত ভাব-বিভাব শেষে ছেয়ে যায় মায়ায়। মানুষটারও তার ওপর অমনিই হয়। এটাও জানা গেছে টের পেয়ে-পেয়ে।

এই মায়ায় তার সব সার্থক মনে হয়। অথচ এখনো চল্লিশের আর যখন খুব দেরি নেই, তখন রমলা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে। জেগে উঠে স্বামী-সন্তানের মধ্যে থেকে প্রেমের জন্য, প্রেম না থাকার জন্য খুব দুঃখ হয়।

তাই ব'লে আর ও প্রেমেও পড়তে চায় না। একটা ঘোরকে চাগিয়ে রেখে-রেখে টান-টান হওয়া আর পোষাবে না। প্রেম ছাড়া এই জীবন আর একদিকে শাস্তির লাগে। আর তাছাড়া নিজেকে বেশ বয়স্ক বলেও মনে হয়।

কিন্তু এইসব দিনে হঠাৎ একদিন তার মানুষটা একটা বাজনা চালিয়ে দিলো। তার টনটনে দিনের উথাল পাথাল করা বাজনা। বাজনার খাঁজ থেকে, টান থেকে ফাঁস থেকে, নিঃশব্দতা থেকে পলপল ক'রে সবকটা অতীতের মন, মনের বাঁক, বাঁকের অনুভবগুলো মাথায় উঠে এলো। স্মৃতি দরজার পাল্লা খুলে তাকে দুর্গের ভেতর ডেকে নিয়ে গেলো। সেখানে বৌ-দুধের তিল, তার চুলের ফশফশে ওড়া, আর সেই অসাধারণ কৃত্রিম শৈশব, (যা সে প্রেমের জন্য পেয়েছিল) শৈশবের নিরুপায় চোখ, চাউনি সব বিহ্বল ক'রে দিলো তাকে। তবু বিহ্বল সে নিজেকে হ'তে দিলো না। শুধু মুঘল দিনের দুর্গের ভেতরে পথে-অপথে ঘুরে বাজনা তাকে এই বাস্তবে এনে খ ক'রে দিলো শরীরে-মনে।

রমলা তখন ছাতের দিকে তাকালো। কিংবা ছাতের কথা ভাবলো। সেখানে টাঁড় ছাতে শুকনো কার্নিশের গায়ে একটা লেবু গাছ হ'লো যেন কোথা থেকে। সেই লেবুর ডালে কনুইয়ে ভর দিয়ে এক পেত্নি অপরূপ ঢঙে দাঁড়িয়ে আছে। বাজনাটা শেষ হ'লে রমলা তাকে দেখলো। যদিও সে তখন ছাতে তাকায়নি একবারও।

খারাপ লাগলো না রমলার। খুব বাস্তবই মনে হ'লো ব্যাপারটা। পেত্নি বা মেয়ে কঙ্কালটা ভারি অবসরের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে এসে দু-দণ্ড।

রমলা সবই বুঝলো। তারপর মন কচ্‌লে সত্যি ক'রে একবার হাই তুলে ফাঁকা ছাতের সেই অদূর লেবু গাছটাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো। এমনকি লেবুর কচি সবুজ ডালের নরম কাঁটার কথা তার মনে পড়লো, কচি লেবুপাতার গন্ধও স্মৃতিতে ভেসে বেড়ালো। পেত্নিটা এসে গেলো। একটা হলদে রঙের বৌ-কথা-কও পাখি সেখানে গান থেমে গেলে এসে বসলো।

রেকর্ডটা বাজায়নি রমলা। আবার যেদিন কেউ বাজিয়ে দেবে সেদিন পেত্নি আসবে কিনা দূর স্মৃতি থেকে সে ভাবছিলো।

২

বেশ কয়েকদিন পরে রমলার পেত্নির ঘোরটা কেটে গেলো। পেত্নি আসার পরপর ক-দিন ধ'রে সে পুরোনো কথায় আবিষ্ট হ'য়ে গেছিলো। এই বয়সে কাজ করতে-করতে তার ফাঁকে ওসব মনে পড়ার আবার একটা অভ্যেস হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পেরে সে ওটা পছন্দ করছিলো না। কিন্তু পেত্নি যেমন নিঃসাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো আবার স'রে গেছিলো, ঠিক তেমনি ক'রেই একদিন দুপুরবেলার জানলার ফাঁকে তাকিয়ে সে মনে-মনে ভাবলো যে 'কই, সে তো আর পেত্নির কথা ভাবে না।' আর সেইবার অনেকদিন পর আবার পেত্নির কথা মনে পড়লো এই কথা ভাবতে।

এখন যদিও তার কোনো প্রেমিক নেই, অর্থাৎ দু জনের দিক থেকে ভালোবাসার সম্পর্ক নেই, তবু রমলা তার শরীরটার মোটামুটি যত্ন নেয়। পেটের চর্বি মোটা হ'লে খাওয়া কমায়, গায়ে নাড়া দেয়, একটু-আধটু ব্যায়াম-টায়াম করে। কিন্তু এই বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা কার জন্য? কিসের জন্য? কী হবে ক'রে?

তার উত্তরও রমলা দিতে পারে নিজেকে। শরীরটা খারাপ দেখতে হ'লে তার বিশ্রী লাগে। চুল পাকায় তার আপত্তি নেই। কিন্তু তাই ব'লে থলথলে পেট—এসব ভাবতে পারে না ও। দুর্গের স্মৃতি তার ভালো লাগে। ঝাড়পোঁচ তাও চলে অনিয়মিতভাবে।

এদিকে মেয়ে বড়ো হচ্ছে তার। সহজ স্বাভাবিক নিয়মে নানা রকম গূঢ় প্রশ্ন অবলীলায় ক'রে বসে মেয়ে তাকে। উত্তর দিতে গিয়ে রমলাকে একটা সত্যি বা দার্শনিক গোছের ধারণা মেয়েকে দিতে হয়। মেয়ের শরীর নিয়ে

তেল মাখানো স্নান করানো করতে গিয়ে সে 'নারীদেহে'র স্ত্রী টের পায়। এত কচি অথচ কী প্রপোরশনেট। মেয়ের পাশে নিজের শরীরটা একটা বুড়ো ভারি মেয়ে ঘোড়ার মতো মনে হয়।

কিন্তু এই তো সময়। সারাজীবনে সে যা করতে পারেনি, এখন এই প্রৌঢ় হাড়ে সেইসব না-তোলা জমির ধান তুলতে হবে। তাই সে তুলছে। ধান। কার জন্য? নিজের জন্য। শুধু-শুধু নিজের?

পেত্নিটাকে ভালো লাগলো ব'লে রমলার দুঃখ হয়। পেত্নি দেখে একটু দুঃখ হ'লেও পারতো তার। চোখে জল কি বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস? কিছুই না সে-রকমের? শুধু ভালো লাগলো?

রমলা বুঝতে পারলো প্রেম তার আর হবে না। অপ্রেমেই দিন চ'লে যাবে।

সব বুঝে রমলা বড়ো মায়ায় ঘুমিয়ে পড়লো।

৩

আবার অনেকদিন পরে রমলা পেত্নিটার কথা ভাবলো। আচ্ছা, পেত্নি কি আর আসবে না? লেবুগাছের কচি ডালে কনুইয়ে ভর দিয়ে বেশ অবসরের ভঙ্গিতে আর কোনদিন কি ছাতের কার্নিশের গায়ে দাঁড়াবে না?

একবার এসেছিলো মনে ক'রে মাঝে-মাঝে ভেবে-ভেবেই কর্পূর হয়ে যাবে সব? চল্লিশ পার হলে কার্নিশের গায়ে নিজেই একদিন ওরকম ক'রে গিয়ে দাঁড়াবে সে—ভাবলো।

তারপর ঘরে এসে আয়নায় কি মনে ক'রে খুব ভালোবেসে যার দিকে তাকালো সেও খুব ভালোবেসে রমলার দিকে তাকিয়ে রইলো। চেয়ে থাকতে-থাকতে রমলার চোখের ভেতরটা ভিজে উঠলো। তারও তাই। চোখের নীচ পাতা দিয়ে জল গড়িয়ে গালে পড়লো। ভালোবেসে রমলার দিকে যে তাকিয়েছিলো তারও গাল বেয়ে জল গড়িয়ে এলো। রমলা বাঁ-হাত তুলে বাঁ-গালের জল মুছে তাকিয়ে দেখলো সেও তাই করেছে।

রমলা ডান চোখের জল মুছতে হাত তুললো। কিন্তু আয়নার হাতও তখন উঠে এসেছে। আয়নায় 'ও' দাঁত বের করলো। রমলাও। লেবুগাছের সমস্ত সবুজ হলুদ আভা, বাজনার শিরা দিয়ে-দিয়ে আয়নার ভেতর থেকে বাতাসে রমলার কানের ভেতরে এসে ঢুকতে থাকলো। শীত-শীত শিরশির কাঁপুনিতে দাঁত বেরিয়ে থাকলো। ঠক ঠক ঠক। আয়নার হাড়ে অশরীরী বাজনা। বাজনার ফাঁপ, বাঁক, শ্লেষ সব মিশে ছাতের হাওয়া থেকে একরকম শিস এসে

ছুটলো।

হাড় আর হাড়ের বিদ্যুৎ-চমকের মধ্যে মাথার তলায় দাঁতের শিস শুনছে রমলা। সামনে সেই গা-শিরশিরে অবসরের ভঙ্গিতে হাসিমুখের মেয়ে-কঙ্কাল। মুখে মাটির তলার হাসি।

কার্নিশের লেবুগাছ আয়নায় এসে ঢুকে পড়ায় রমলা আশ্বস্ত হ'লো। ইচ্ছে হ'লে সে আবার মন-কেমন-করা ধাঁধায় এইখানেই পেত্নির সন্ধানে এসে দাঁড়াবে, আবার।

পেত্নির সঙ্গে চুল বাঁধবে। চোখ মুছবে। ভালোবাসবে। উঠবে বসবে শোবে।

আহা কী মায়া!

P 30283

এই থাকা, এই অমিতাভ

রাধানাথ মণ্ডল

মাঝে মাঝে বড়ো আশ্চর্য মনে হয় অমিতাভর। এই চারদিকটা হঠাৎ হঠাৎ কেমন বদলে যায়। তার শরীর দিয়ে ছোঁয়া, চোখ দিয়ে বেঁধে রাখা দৃশ্যাবলী ঠিক ঠিক চেহারায় থাকে না। মাঝে মাঝেই তারা রঙ বদল করে নেয়। যেমন ধরা যাক, তারা হয়তো বসে আসে তাদের বাড়ির বসবার ঘরে, হয়তো রমেনদার সঙ্গে গল্প করছে। কখন যেন সে দেখে সামনে ছড়ানো দিগন্ত, দূরে একের পর এক সাজানো পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে একটু একটু করে। রমেনদার কথায় চমক ভাঙে। কীরে, কী ভাবছিলি? একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, লজ্জিত হয়ে সে জবাব দেয়। হুঁ, মনেই হচ্ছিল না যে তুই এখানে ছিলি। এর উত্তরে শুধু একটু হাসে সে। বলতে পারে না, সত্যিই এখানে ছিলাম না রমেনদা। আমার এরকম হয়। আমি এক্ষুনি এখানে আছি, আবার এক্ষুনি থাকব না। আমি কোনও শক্ত অসুখে পড়ে যাচ্ছি কিনা জানি না। এমন কি রমেনদা, এই যে আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়িতে এসেছেন, এই যে গল্প করছেন, আমি এর কোনোটাতেই মন দিতে পারছি না। কেবলই সরে যাচ্ছি। বদলে যাচ্ছে আপনার চেহারা। এক্ষুনি মনে হল, আপনার ওই লম্বা লম্বা চুল, আপনার ওই ঝুলন্ত গোঁফ কিছুই আমার সামনে নেই। তার বদলে আছে অন্য কেউ, অন্য একজন। অথবা তা কেন ভাবছি? আসলে আমিই থাকি না। আমার এই বসে থাকা, পায়ের উপর পা, সোফায় হেলান-দেওয়া পিঠ, জানালার পরদায় চোখ, কোনোটাই ঠিক নয়। এই ঘরে, আমারই এই বসার ঘরে, আপনি আছেন, সোফা, সেনটার টেবিল, ফুলদানি—এসব আছে, আমি নেই। আমি থাকি না। এসব কোনও কথাই রমেনদাকে বলা হয়ে ওঠে না, সে তবু মামুলি গল্প করে, হাসির কথায় হাসে, সিগারেট ধরায়, ছাইদানিতে ছাই ফেলে। রমেনদার যাবার সময় দরজা খুলে দেয়।

কিন্তু কেন এমন হয়? মাঝে মাঝে সে ভাবে। সত্যি সত্যিই কি আমার কোনও তীব্র অসুখ হচ্ছে? রুচিরা মাঝে মাঝে এই নিয়ে ঠাট্টা করে। চা দিয়ে যায়। একটু জোরে টেবিলের উপরে কাপটা নামিয়ে দিয়ে বলে, এটা চা। মনে করে খেও। যেন অন্য কিছু ভেবো না, জিভ পুড়ে যাবে। না, মনে

আছে। সে জবাব দেয়। তারপর চায়ের কাপ হাতে নিয়েই ফের অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কে চা দিয়ে গেল? রুচিরা? চোখে চশমা আছে মনে হল? রুচিরা তো চশমা পরে না! দৃষ্টিটা মনে হল অন্যরকম? যেন বা দূর থেকে ভেসে আসছে? সুদূর এই দৃষ্টি কার? সে রুচিরাকে ডাকে। দু'মিনিট চোখের দিকে চেয়ে থাকে। কী হল? রুচিরা জিজ্ঞেস করে। তোমার চোখগুলো দেখছি। সে জবাব দেয়। যত্তো সব—বলে লজ্জা পেয়ে রুচিরা চলে যায়। আর সে মাথায় হাত দিয়ে বসে। হঠাৎ রুচিরার চোখকে অন্যরকম মনে হল কেন? যে-চোখ আমি রোজ দেখি, সেখানে আজ চশমা দেখতে পেলাম কী করে?

সে যখন সন্ধ্যার আগে তাদের ছাদে রুচিরাকে নিয়ে বেড়ায়, একটি দুটি তারা ফুটে ওঠে আকাশে, তখন তার চারদিকের গাছপালা ঝাপসা হয়ে যায়। কোত্থেকে একটা নদী বয়ে আসে তাদের বাড়ির সামনে। চারদিকে তৈরি হয় মাঠ, মাঠের ওপারে কারা জলসেচ করে, হিম জমা হয় ঘাসে ঘাসে। তখন তার পাশে সে কে? যার মুখের দিকে তাকিয়ে সে সময়ের রঙ চিনে নেয়, যার সঙ্গে হাঁটলে গাছের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উঁকি দেয়? কে সে? সে তো রুচিরা নয়! এই পরিপার্শ্ব তাদের বাড়ির নয়। এই পরিবেশ অন্য কোনও জায়গার, এই সন্ধ্যা, এই সময় সব আলাদা।

এসব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সে তার ঘরের চারদিক, তার অবস্থান সে মুখস্থ করে রাখে। জানালার পাশে রাখা খাট, দরজার দিকে মাথা। বাঁদিকে তাকালে বুকসেলফ, মাথাটা একটু তুললে আয়না। আয়নায় প্রথম ধরা পড়বে তার বাঁ কান, একটু হেললে তার জট-পাকানো চুল, তারপর মুখটা! জানালার ওপাশে গাছ, তা পেরিয়ে পুকুর। পুকুর দেখতে হলে তাকে সটান উঠে বসতে হবে। রুচিরার ঘরে ঢোকার অনুষঙ্গও তার জানা। খুব মৃদু শব্দ, প্রায় শব্দ না থাকার মতো। তারপর শাড়ির একটু খসখস, চুড়ির একটু টুনটুন। একটা পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পদক্ষেপ। তারপর আরও একটা। তখনই অমিতাভ জেনে যায়, রুচিরা এসেছে, রুচিরা।

তার স্মৃতি অবশ্য এমনিতেই তীব্র, তবু সে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে থাকে। ডানদিকে জানালা, দরজার দিকে মাথা। বাঁদিকে বুকসেলফ, মাথা তুললে আয়না। আর ঠিক তখনই গোলমাল হয়ে যায়। ডানদিকে দরজা, বাঁদিকে দরজা। হঠাৎ কেউ ঢুকল ঘরের মধ্যে। তার সমস্ত চেতনাকে

আচ্ছন্ন করে দেয়। অনিবার্যভাবে সে বাড়িয়ে দেয় হাত। প্রথমে আলতো করে তারপর জোরে কেউ ধরে। সে বুকে টেনে নেয়। গাঢ় হয়ে কারও ঠোঁট নেমে আসে তার মুখে। কারও চুলের ভিতরে তার নিশ্বাস ডুবে যায়। আচ্ছন্নের মতো সে শুয়ে থাকে তার বিছানায়। অনেকক্ষণ পরে তার ঘুম ভাঙে। কে, কে যেন! সে সঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

আজকাল তাই অমিতাভর ঠিকানা বলতে বড়ো অস্বস্তি হয়। বাড়ি বদলেছেন শুনলাম। কোথায় আছেন? চেনা কেউ জিজ্ঞেস করলে তাকে বলতে হয়। রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বর—সব। তবু খিঁচ যায় না সত্যি সত্যিই কি আমি থাকি—ওই বাড়িতে? সবাই যেখানে আমাকে দেখে, খামের উপর যা লেখা থাকে, সেটা কি আমার বাসস্থান? এই আমি, অমিতাভ মিত্র, উত্তর-তিরিশ একজন যুবক, আমি বসার ঘরে বসে রমেনদার সঙ্গে গল্প করি, শোওয়ার ঘরে রুচিরার পাশে ঘুমোই, মাথার দিকে দরজা, বাঁ-পাশে রাখা সারি সারি বই—এই আসবাবপত্রে, এই মানুষজনের মাঝখানে আমি কি বাস করি? নাকি অন্য কোথাও আমার থাকার কথা ছিল? অন্য কোনও ঠিকানায়? চারদিকে কেবল সবুজ গাছ পাখির ডাক। লেবু পাতার গন্ধে রোদ এসে সেখানে মাথা রাখে। সারাদিন নদীর গল্প, ঘুলের গল্প সমুদ্রের গল্প। সেখানে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে রাত্রি ঝরে পড়ে। সেখানে আকাশের নিচে অজস্র স্বপ্ন জমা হয়। আমার এরকম কোনও জায়গায় বাস করা উচিত ছিল? এত দিন, এই বয়স অবধি আমি কি তবে ভুল ঠিকানায় থেকে এসেছি?

এই সব চিন্তায় পীড়িত অমিতাভ মাঝে মাঝে বড়ো অস্থির হয়ে পড়ে। এই তো আমি আছি এইখানে। সে চিৎকার করে ওঠে। আমি আছি, আমি আছি—গোটা অঞ্চলের লোককে ডেকে এনে দেখাতে ইচ্ছে হয়। এই আমি, অমিতাভ মিত্র, এখন আমার ঘরে শুয়ে আছি। যে-ঘর আমার চেনা, যে-বিছানার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এতদিনের সেখানে। এবং পাশে রুচিরা। আমি হাত রাখলাম রুচিরার গায়ে। আমার এই স্পর্শ, এই চুম্বন—রুচিরাকে। এই ঠোঁট, এই গন্ধ রুচিরার। আমার নিশ্বাস তার বুকের উপত্যকা দিয়ে নেমে যায়। তার শরীরের প্রতিটি রোম আমার ঘনিষ্ঠ হয়। রাত্রির এই মধ্য প্রহরে, আমার খুব কাছে, আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে এখন রুচিরা, শুধু রুচিরা। আর ঠিক তখনই বিভ্রম ঘটে। কে? এই স্পর্শ কার? এই চিবুক, এই স্তন, এই ঘনিষ্ঠতা অন্য কোন্ রমণীর? এই চুম্বন, এই ভালোবাসা কাকে? এই রাতে আমার সমস্ত সান্নিধ্য জুড়ে অন্য কে শুয়ে আছে? এক লাফে উঠে খুব দ্রুত হাতে আলো জ্বালায় অমিতাভ। এ তো রুচিরা। এই বুক, এই মুখ এ তো রুচিরার। তবুও সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। সে খুব ঝুঁকে ভালো করে চেনার চেষ্টা করে।

সাইলেন্স ! সাইলেন্স !

কল্যাণ সেন

ঘরের ভেতর আবছা আলো, চার দেয়ালের রঙ তিনরকম ; মাঝখানে গাঢ় হলুদে ঢাকা একখানা খাট ; (ওখানে বসে কেউ গান গেয়ে গেছে ? বা একটু পরেই শুরু হবে গান ?) দেয়ালে বসে আছে রাবণের বিখ্যাত দশমাথা, দেয়ালে চমৎকার উড়ে যাচ্ছে নীল-কালো পাখি। দু রকম রঙের জানলা ; জানলায় খানিকটা ছাই ছাই পুরনো আকাশ। ঠিক চোখ থেকে পাঁচ-ছ ফুট দূরে চাপা খয়েরি দেয়ালে ঝোলানো কত দূরের এক দেশ, এক পাহাড়ি পথে বোধহয় সূর্যাস্ত ; আর সেই সূর্যাস্তের দিকে হেঁটে যাচ্ছে কিছু মানুষ ; মুখের চামড়া ভেঙে গেছে তাদের, চোখ কোঁচকানো ; দৃশ্যটা থেকে কী পরিষ্কার কোনো দুর্গম মন্দিরের ভারি ঘণ্টার শব্দ এখন ছড়িয়ে পড়ছে ওই ঘরে ?

পর্দা নড়ে উঠলো ; কেউ তাহলে আসছে এই ঘরে ? নাঃ, হাওয়ার শব্দ ওঠে, জানলার পাল্লা একদিক বন্ধ হবার আগে ক্যাঁকর্ ক্যাঁক্ কর্কশ ডাক ছাড়ে, মেঝেতে কোত্থেকে নেমে এসে এলোমেলো গড়াতে থাকে ছোট ছোট হলুদ ফুল। বাঁ দিকে ঠিক তিন বা চারফুট দূরে একটা নকল ফায়ার-প্লেস ; আগুনের দাগ নেই, অথচ চোখ পড়লেই মনে হয় ঘরের ভেতর হিম, বাইরে নির্জন অন্ধকার রাস্তায়, গাছের শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে বরফের প্রলেপ ; শীত কামড়ে ধরেছে রাত ; আর আগুনের ভেতর দেয়ালে নাচছে দুতিনটে অসমান ছায়া ; আঙুরের রস পড়ে আছে কাচের মগে। এসব মনে হয় ; নতুন তামার পয়সার রঙের একটা কিউরিও দাঁড়িয়ে আছে ফায়ার-প্লেসের মাথায়। মূর্তিটার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মূর্তিটা জীবন্ত হয়ে ওঠে, সোজা উঠে আসে চোখের ভেতর ; অদ্ভুত ! মুহূর্তে ঘরটা যেন হয়ে যায় মরু ; আর হলুদে ঢাকা খাটটা এরিনা ; নেমে এসেছে ফায়ার-প্লেসের মাথা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন ; অথবা গভীর রিপুদহন ; কে কার আগুন তখন ?

দরজার বাইরে কেউ বাজালো নাকি ডোর-বেলটা ? শব্দ শোনা গেল টুং টিং টিং···টুং টুং···টুং টুং··· অথচ দরজা তো খোলাই আছে ; কোনো খেলার নিয়মে বেজে উঠলো দরজাটা ? অনেকবার বাজবে এরপর ; আর বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো অন্য রকম, এইঘর অন্যরকম, দেয়ালের রঙ

অন্য রকম ; হলুদ খাটটা পিছিয়ে গেছে দেয়ালের গায়ে ; সবুজ শাড়ির ঘুরে বেড়ানো সমস্ত ঘরে, তার চাপা গলায় কী মেঘ-মল্লার ? সে কী জানলা দিয়ে ঝুঁকে মুখ নামিয়ে নিচের রাস্তায় কোনো পাখির ফেলে যাওয়া পালক খোঁজে ? সে কী ছোট, সাদা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে শাওয়ারের নিচে ক্রমশ হারিয়ে যায় জলের শব্দে শব্দে ? ঝির ঝির···ঝির ঝির···জল পরে, ভেঙে দেয় খেলার নিয়মে ; যা কিছুতেই ধুয়ে যায় না রক্তের প্রায় কালো হয়ে আসা দাগ, তখন ঘরের ভেতর ওই কিউরিও নয় তবু কিউরিও-এর মতন একজন মানুষ আবছা আলোয় চোখের ওপর তুলে আনে নিজের করতল ; হাতের জটিল নক্‌শা খুলে দেখে : জাতকের মঙ্গলের শুভযোগে ও গ্রহাধিপত্তির মিত্রদৃষ্টিতে রাজসুখ কল দুষ্ট হয় ; দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে নারি কায়ার-প্লেস ? হা-হা-হাওয়া জানলা দিয়ে ঘরে এসে পাহাড়ি পথের সূর্যাস্তের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ? ন্‌না এ রকম নয় ; কিছু নয় এ সব ; ভোর-বেল্‌ বেজে ওঠেনি ; পাহাড়ি পথের সূর্যাস্ত এখন সমস্ত ঘরের দেয়ালে দেয়ালে, জানলা দরজার গায়ে ; খাটের হলুদে কিউরিওর উজ্জ্বল শরীরে।

ছোট, নিচু, পর্দা ঢাকা গোল টেবিল ; কাচের ঘেরা টোপের ভেতর তাজমহল, সেই তাজমহলের তলায় চাপা দেওয়া দুতিনটে ম্যাগাজিন ; বাহ্‌ ! একটা ম্যাগাজিনের ছয়ের পাতার শেষ দু কলমে শুরু হয়েছে আমেরিকার কিছু মানুষ কেমন করে ফিরে যাচ্ছে বনজঙ্গলের নেশায় ; ছবি : বাথ-টবে ফুটফুটে বাচ্চাকে স্নান করাচ্ছে হয়তো তার মা ; জঙ্গলের লম্বা লম্বা ধারালো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে কুচকুচে কালো একটি ঘোড়া ; টাটকা সবুজ চারপাশে, খালি-গা পিঠে ব্যাগ বাঁধা প্রায় কমলালেবুর মতন রঙ কিছু মানুষ চলেছে জঙ্গলের সরু পথের ভেতর দিয়ে ; আর একটা ম্যাগাজিনের মলাটে আলুসেদ্ধ-শরীর কোনো সিনেমা-সুন্দরী ; সুন্দরী তার নকল চোখ দিয়ে কী তাকিয়ে আছে ওই আশ্চর্য কিউরিওটার দিকে ?

ডানদিকে ঠিক দু থেকে তিন ফুট দূরে দেয়ালের মাপে টানা একতলা বুক শেলফ্‌ ; কাচের আড়ালে লম্বা, বেঁটে, সরু মোটা বই, বই ; যেন ছত্রছাড়ার সংসার ; কোনো যত্নের হাত পড়েনি বইগুলোর গায়ে ; ওপরে চোখ তুললেই চোখ জুড়ে বিশাল একখানা ছবি ; একটা অপরিচ্ছন্ন, পরিত্যক্ত ভাঙা ভাঙা গীর্জা, গীর্জার শরীর কাকের গলার রঙের ; মাঠের ঘাস লম্বা লম্বা, কেমন কালচে

চেহারা মাঠের, বোঝা যায়, কতদিন ওই গীর্জার দরজা খোলা হয়নি, কতদিন দল বেঁধে কিছু পা ওই ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়নি, গীর্জার ছুঁচলো মাথার গায়ে এক আশ্চর্য ঘড়ি ; সময়ের ঘরগুলো উল্টোপাল্টা, অক্ষরগুলো আবোল-তাবোল, বেশ কয়েকটা কাঁটায় বোধহয় মিনিট আর ঘণ্টা একই সঙ্গে বেজে যাচ্ছে ; যেন এই ছবির শিল্পী স্বপ্নের মধ্যে বসে বসে এই ছবিটা এঁকেছিল হাজার হাজার বছর ধরে ; ওই গীর্জা আর মাঠ কী তার নিজেরই দুঃখের গল্প ?···

এই ঘরে না ঘরের বাইরে, সত্যি সত্যিই শোনা গেল ঘড়ির শব্দ ? ঘড়ির শব্দ অন্যরকম, ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ছোট্ট পাখি শিস্ দিয়ে উঠলো, পাখির ঠোঁটে সুসময়ের সংবাদ, আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে, সব তারা দেখা যাবে আকাশের, শিশুরা দুরন্তপনা থামিয়ে ভালিম কুমারের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে ; বন্দরের জাহাজের মাস্তুলের মাথার পতাকা ক্রমশ দূরে সরে যেতে যেতে জানাবে বিদায়, বিদায় ! নর্তকী তার নাচের পোষাকের গোপনতা থেকে ছুরি বার করে এনে খুঁজে বার করবে, কোথায় লুকিয়ে আছে শেষরাতের ক্লান্তি, ভয়, ঘুম না আসা লম্বা অন্ধকার।

সাইলেন্স !!

লেখা আছে লাল লাল অক্ষরে ; দরজার প্রায় মাথায় প্রত্যেকটা অক্ষরকে মনে হয় ভীষণ নিষ্ঠুর ; যেন হঠাৎ লাফ মেরে উঠে এসে তছনছ করে দিতে পারে এই ঘর, চেপে ধরতে পারে গলা, বা ছিটকে পড়ে যেতে পারে ফায়ার প্লেসের ভেতরে, তখন কী ছবির মানুষগুলোও আগুনে পুড়বে ? মেঝেতে ছড়ানো হলুদ ফুলগুলো তাহলে কালো হয়ে·····

আশ্চর্য ! দুরন্ত হাওয়ার শব্দ ঘরের দেয়াল থেকে দেয়ালে, রাবণের দশমাথা কেঁপে ওঠে, নীল-কালো পাখিরা কী জানলা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পুরনো আকাশে ? দরজায় হা-হা শব্দ ; জানলায় হা-হা শব্দ ; বারান্দা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা কুচকুচে কালো ঘোড়াটা বন থেকে ছুটে এসেছে এই ঘরের ভেতর ? গীর্জার দরজা খুলে যাচ্ছে ; চারদিকে মানুষের প্রার্থনা।

সাইলেন্স !!

দরজার ওপিঠে এখন অন্যরকম আলো, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে মানুষের আপসা কথাবার্তা, পর্দার নিচের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল নাকি পর পর কিছু পা ?

এদিকে ভেসে আসছে ব্যস্ততার শব্দ ; পর্দা কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ ? ওদিক, এদিকে আসছে না কেন ? এদিক, ওদিকে যাচ্ছেনা কেন ? বিশ্রি ঝাঁঝালো, স্নায়ু অবশ করা একটা গন্ধ মিশে যাচ্ছে বাতাসে ; ঘরের অবছা আলো কে মুছে নিয়েছে হাত দিয়ে ? হলুদে ঢাকা খাট ভরে যাচ্ছে চাপা গোঙানির শব্দে ? পায়ে লেগে উল্টে গেল নাকি অ্যাশট্রে ?

আঙুল কাঁপছে,

চোখ বন্ধ হয়ে আসছে,

লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে বুকের লাব্‌ডাব লাব্‌চাব শব্দ ;

ছাদ থেকে ক্রমশ বিষাক্ত পোকাদের মতন নামছে সাইলেন্স—সাইলেন্স।

ঘরের ভেতর সবুজ শাড়ি, ঘরের বাইরে সবুজ শাড়ি, নিভে আসা আকাশ এখন সবুজ, সবুজ, মেঝেতে খুলে খুলে পড়ছে হাত, পা, চোখের কারুকাজ ; বুক-শেলফের কাচ ঠেলে জেট প্লেনের গতিতে সমস্ত ঘরে উড়ে এসেছে অসংখ্য কালো কালো অক্ষর ; পর পর দাঁড়িয়ে পড়েছে দুর্দান্ত মিছিল ;

পাপ। ক্রোধ। অহংকার। আত্মহত্যার অধিকার,

স্বপ্নের সবুজ না নীল-কালো ;

—কেন হাত কাঁপে ?

—কেন ভয় ? —কেন ঘুম না এলে·····

ঘরের সব কিছু অন্যরকম এখন ; যেন এটা কোনো ঘর নয় ; এক নদীর শুকিয়ে আসা হাত যেন, বাইরে কারা ? বাইরে কী ? দেয়ালের রঙ পালটে কাকের গলার মতন ? কোথায় গেল ফায়ার-প্লেস ? নিচু, ছোট, গোল টেবিলের কাচের ঘেরা টোপে তাজমহল কোথায় ? চারপাশে লম্বা, পুরনো ঘাস, ঘাস, ঘাসের পুরনো গন্ধ ; সূর্যাস্তের পাহাড়ি পথ ঢাকা পড়ে গেছে অন্ধকারে, বাইরে আবার দরজার বেল্ বেজে ওঠে ? অথচ দরজা তো খোলা ;

—ক্রিং ক্রিং ক্রিং

বাজছে, বেজে যায় ;

—ক্রিং ক্রিং ক্রিং

কাকে খোঁজে এই শব্দ ?

—ক্রিং ক্রিং ক্রিং ·····ক্রিং ক্রিং ক্রিং

এখন এবার এরপর·····

আরেক বাঁচা

কালীকুমার চক্রবর্তী

স্যামার নিকট আইস
আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব

চার্চের মাথায় নীল কালিতে লেখা সাদা বোর্ড। আরেক বার পড়ে নেয় অঞ্জন। হাসে। শান্তি? কিসের শান্তি? আত্মার, না জীবনের? আত্মার নিশ্চয়ই নয়। যা অদৃশ্য, তার আবার শান্তি কিসের?

আবার হাসি পায়। কিন্তু হাসে না সে, খুক্ খুক্ শব্দ করে কেশে ওঠে। কাশি দিয়ে হাসি তাড়ায়। আর জীবনের শান্তি? সে তো মানুষ নিজেই তৈরী করে। ইচ্ছে করলে বানিয়ে নিতে পারে। আসলে মন। মন ঠিক থাকলে জীবনের শান্তি আপ্‌সে ধরা পড়ে। ঘুড়ির পেছনে যেমন সুতো ধরা।

এইবার দাঁড়িয়ে পড়ে সে। মাথা উঁচিয়ে সামনের বাড়ীটা স্যাখে। বাড়ীর মাথা ছাড়িয়ে কলকাতার আকাশ। নীচে থেকে আকাশটা খুবই ছোট দেখাচ্ছে। এক ফালি নীল-সাদা চাদর পাতা যেন, তবে তা ময়লা।

দৃষ্টি ঘোরায় অঞ্জন। ঘুরিয়ে নিয়ে সামনের বাড়ীর গেটে ফেলে। এটা নৈমিত্তিক অভ্যাস তার। এরপর বাঁয়ে, ডাইনে কয়েকবার তাকিয়ে নিয়ে রাস্তায় নামবে। ট্রাফিক জ্যাম। এ গাড়ীর পেছনে ও গাড়ীর সামনে যাবে খেলতে খেলতে উল্টো ফুটপাথে গিয়ে উঠবে। আজও ঠিক তেমনি অভ্যাসে উঠে আসে সে।

ফুটপাথ প্রায় ফাঁকা। তবু পাশ থেকে ঢ্যাঙা মতো একজন হঠাৎ তাকে ধাক্কা মারে। অমায়িক হাসে, বিড়বিড়িয়ে বলে—একেবারে নতুন, আইডিয়া করুন স্যার, আইডিয়া, চোখ তুলে তাকিয়েই বুঝে ফেলে অঞ্জন। পিম্প। —না, যাবো না, ভাগো শিগ্‌গীর। লোকটা ততক্ষণে অনেকদূরে। ফিরেও তাকায় না আর।

একটা শ্বাস পড়ে অঞ্জনের। লম্বা দীর্ঘায়িত। শান্তির কি? কে জানে? তবে শান্তি নামক যে পাখিটা পুষেছিল সে তা তো কবেই উড়াল দিয়েছে। সুখের পাখিরা নাকি অমনি ভাবেই পালিয়ে যায়। আচমকা, জানান না দিয়ে। বড় আদর খেকো পাখি যে।

একটা কথা শুনবেন স্যার?

চমকে তাকায় অঞ্জন। না. সেই ঢ্যাঙা লোকটা নয়, এক বুড়ো। দেখতে নিপাট ভদ্রলোক। তার পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। বিগলিত মুখ অথচ বিষণ্ণ হাসছে সে।

—বলুন।

—আমার ছেলের টি-বি, কিছু সাহায্য করবেন ?

—না।

বলেই এগিয়ে যায় অঞ্জন। দু'পা গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ে। বুড়োটার দিকে খর দৃষ্টিতে তাকায়। দু'চোখ কুঁচকে ফেলে। তারপর আচমকা একটা সিকি বের করে বলে—মিথ্যে বলছেন জানি। তবু দিচ্ছি, এত সুন্দর করে গুছিয়ে মিথ্যে বলতে পারে না কেউ।

—তাহলে দেবেন না স্যার।

—ক্লাশ, ক্লাশ

হাতে সিকিটা গুঁজে দিয়ে বড় বাড়ীটার গেট দিয়ে ঢুকে যায় ভেতরে। লিফটের সুইচ টিপে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ। তারপর কি মনে করে আর দাঁড়ায় না। সিঁড়ি বেয়ে তরতর ওপরে ওঠে। ভেতরে তার কথার খেলা, তাস সাফলের মতো একটার পর একটা ভাঁজে ভাঁজে নড়ে চড়ে, খেলা করে।

তুমিও কি শান্তি খুঁজছো মৌসুমী ? অথচ ন্যাখো শহর জোড়া তোমার নাম। অভিনেত্রী মৌসুমী রায়। একবার ষ্টেজে উঠলে নাকি চাদ্দিক গরমা-গরম। সংলাপ বলতে হয় না। তার আগেই চটাস চটাস হাততালি।

প্রোডিউসার মনোজ সরকার স্বভাবতই তোমাকে বাড়তি খাতির করেন। মানে ওই আদর-টাদর আর কি ! নিজের গাড়িতে চড়িয়ে কোয়ার্টারে পৌছে দ্যান। তোমাকে খুশি রাখতে এমন সব ব্যাপার নাকি করেন, তোমার ভাষায় তা ছেলেমানুষি, ছেলেমানুষি, একেবারে ছেলেমানুষি।

কিন্তু বিশ্বাস করো মৌসুমী কোন কিছুর ব্যাপারে আমার কোন ভূমিকা নেই। রূপালীর, মানে আমার স্ত্রীর ব্যাপারেও না। সে যে কিভাবে মনোজ বাবুর সাথে পরিচিত হলো, অভিনয় বিদ্যা শিখে ফেললো, বা তোমাকে টেক্কা দিলো, আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানি না।

রূপালী আমাকে সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলতো বটে। মানুষের মতো বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখাতো। বড় হবার জন্য নাকি মানুষ অনেক কিছু করে। ঝুঁকিও নেয়। সেও নিয়েছে। তো মৌসুমী, স্বপ্ন কে না ভালবাসে ? আমিও

ভালবাসতাম। তাছাড়া সংসারের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য··· ··

রূপালী যেই জয়েন করলো, তোমাকে দেওয়া হলো পার্শ্বনায়িকার ভূমিকা। অথচ তোমার ভাষায় সে নাকি রূপসী নয়। নায়িকা হবার উপযুক্ত নয়। তবে সেক্সী। অভিনয়ে যা দরকার, তুমি বলতে, তা নাকি শরীর। সেই শরীরই কেড়ে নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা, এবং মনোজবাবুর মন। অর্থাৎ অভিনয় নয়, শরীর গুণে। রূপালী নায়িকা। তাই তো বলতে চেয়েছো তুমি। তাই না মৌসুমী?

একেকদিন ব্যঙ্গ করে বলতে—তোমার তো মহাসুখ অঞ্জন। বৌ রোজগার করবে, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খাবে তুমি। আজকাল কোন স্বামী খুঁতখুঁতে থাকে না। অনেক কিছু ছেড়ে ছুড়ে দ্যায়। তোমার আপত্তি কেন?

আকুপাংচার, একেকটা সূঁচ ফুটিয়ে যেন ধৈর্যের পরীক্ষা করতে। নাকি আমার পৌরুষকে বিদ্ধ করতে? এই সবের অর্থ কি মৌসুমী? আসলে তো ওঠাওঠির ব্যাপার। ওপরে ওঠার, ভবিষ্যৎ গড়ার যেন গুঁটি খেলা। আমিই সেই পুতুল নাকি? না হলে খেলনার খেলা এত জ্যান্ত হয়?

রূপালী ডাইভোর্স করেন নি এখনও। অথচ সেই রকমই আমাদের জীবন যাপন। সে থাকে আলাদা ফ্লাটে। আমি থাকি সেই পুরণো বাসায়। সঙ্গে ছয় পোষ্য। রূপালীর মাসোহারায় আমার জীবন চলে। চলে মানে চালাতে হয়। অর্থাৎ শান্তি সুখের জন্য মুখ বুঁজে···

বেল টিপতেই ভেতরে জলতরঙ্গের বাজনা বেজে ওঠে। দরজা খুলে মুখ বাড়ায় মৌসুমী, হাসে, ঠোঁট কামড়ায়। প্রশ্ন মুখে তাকায়। অঞ্জনও হাসতে চায়। জিভ বের করে অদ্ভুত শব্দ করে। ভেতরে ঢোকে। মৌসুমী কাপড় সামলে-সুমলে আবার হাসে।

—আজ বেশীক্ষণ বসা চলবে না কিন্তু।

—কেন?

—ওমা জান না? মনোজবাবু আসবেন, তার নতুন বইতে এবার আমি হিরোইন।

—সে কি? রূপালী?

—কেন পার্শ্ব নায়িকা।

বলে খিল খিল হেসে ওঠে মৌসুমী। নিষ্ঠুর শিল্পময় সেই হাসি। হাসতে হাসতে বলে—তোমার খাওয়া পাওনা রইল।

—কেন ?

—বাঃ, তোমাকে ধরে থেকে আমার কত লাভ হলো। দাম বাড়লো। কপালী ডাউন হলো, মনোজবাবুর নজরে আসা গেলো।

বলে আবার সেই হাসি হাসে মৌসুমী। হাসতেই থাকে। বড় নিষ্ঠুর, কুৎসিৎ হাসি, অথচ শিল্পময়।

অঞ্জন উঠে দাঁড়ায়, তার কপালের রগ দপ দপ করে ওঠে। মাথা ঘুরে যায়। টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। নেমে গিয়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়ায়। ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে, হুহু করে বেড়ে উঠছে আগুন।

আমি তাহলে কোন্ ভূমিকায় মৌসুমী ? কোন্ ভূমিকায় ? —সূত্রধর, সূত্রধর, ভেতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে। —তুমি সূত্রধর, সূত্রধর। —না আমি সূত্রধর নই, কারো মিডিয়া নই। আমি নিজে যা তা-ই।

তার চোখের সামনে এখন সেই বাণী। সাদা বোর্ডের ওপর নীল কালিতে লেখা, জ্বল জ্বল করছে—আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।

ফুঃ ফুঃ। তাচ্ছিল্যে মুখ বেঁকায় অঞ্জন। একটা বিরক্তিকর শব্দ করে। কে কার শান্তি দেবে হে ? সুখ পাখি তো আদর খেগো। উড়ে যায় যখন তখন। তাকে ধরা ? ছোঃ, ছোঃ।

একটা রাগ মেশানো যন্ত্রণা অঞ্জনের ভেতর হঠাৎ ঢুকে পড়ে। তা ঘুরতে থাকে ভেতরে। নাগর দোলার মতো, ক্রমাগত, একটানা। আচমকা সে চীৎকার করে ওঠে—এনকোর,……

—এনকোর, এনকোর। ছুটতে থাকে পাগলের মতো। ছুটতে গিয়ে পড়ে যায়। পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়ায়। উঠে আবার পড়ে। অনবরত চেঁচায়—এন্‌কোর, এন্‌কোর। —পাগল নাকি ? —বাইনচৎ। —মাতাল নাকি ? তোর বাপ্। —ঘোড়েল মশাই, ঘোড়েল - শালা হারামি।—মার শালাকে, মার।

উঠতে গিয়েও উঠতে পারে না, অঞ্জন। হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে। কানের কাছে কারা যেন ফিস ফস করছে, সে শুনতে পায়, পায় না। তার কপালে হাত পড়ে, মুখে হাত পড়ে, বুকে হাত পড়ে, অসংখ্য হাত এসে শরীরটাকে বুঝি ঘিরে ধরে। ঘিরে ধরে কিছু বলতে চায়, জোরালো গলায় বলতে চায় কি

সে শুনতে পায় না, বরং যেন শুনতে পায়

শান্তি দিব—শান্তি দিব—শান্তি……সে শুনতে পায় না, বরং শুনতে পায় এক নাগাড়ে কারা যেন বলে চলেছে।

আশ্রয়

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় দু ঘণ্টা উজোন ডিঙা বাইবার পর চিনিবাস ভাখে ছোটগাঙ পেরিয়ে এখন তার বইঠা বড়োগাঙের জল কেটে কেটে এগুচ্ছে জঙ্গলমুখো। প্রথম যৈবনটায় এসব গাঙের রঙতামাসা, চোরাটান, জঙ্গলের খাঁড়ি তার হাতে গোনা ছিলো, কতোবার সিরেফ রগড় করে ডিঙি গোমর নদীর জলে ভাসিয়ে চলে এসেছে চামটায়, বড়ো হলদেয়, ছোট হলদেয়। সাথে দু-একজন একবয়সী। একটা বড়োসড়ো হরিণ সাবাড় করে ডিঙিতে তুলে ফিরে গিয়েছে নিজেদের তল্লাটে। যেই কথাটা শুনেছে, ডরিয়ে উঠেছে তারা, 'হাই বাপ্, বড়োমিঞার রাজত্বি থিকে পেরানটা ফিরিয়ে এনেছিস, এই ঢের।' শুনে চিনিবাসরা হাসতো।

তারপর খাসজমি পেয়ে চাষবাস শুরু করার পর আর এমুখো হয়নি সে, শিকার-ফিকার ভুলে গিয়েছিলো। কিছুদিন পর্যন্ত হরিণের গন্ধে চনমন করে উঠতো তার হাত দুটো, কিন্তু নানান্ ঝক্কি ঝামালায় পড়ে এখন আর নোলা ভিজে ওঠে না। শুধু চামটা, বড়ো হলদে, ছোট হলদের জঙ্গলের গুরগুরানিটা তার কলজের ভিতরে আজো সেঁধিয়ে রয়েছে।

বইঠা বাইতে বাইতেই সেটা বুঝতে পারে সে। বড়োগাঙের কোল ঘেঁষে সবুজ পাতালতার ঝোপ হুমড়ি খেয়ে ছুঁয়ে আছে জল, মাঝে মধ্যে খাঁড়ির লোভ জলকে ফুসলিয়ে টেনে নিয়ে গেছে বহু দূর, কতো দূর, তা চিনিবাস জানে। তার আঠারো বছরের কলজে যা জানতো না, এখন তিরিশ বছরের কলজে তা হাড়ে হাড়ে জেনে গেছে। এরকম একটা খাঁড়ির কাছাকাছি চিনিবাস তার হুজুলতো ডিঙিটাকে দাঁড় করায়। এই বিকেলের মুখটায় হরিণেরা দল বেঁধে জল খেতে আসে, এ তার হাতে গোনা। তবুও অন্ত একজোড়া চোখের চোরাটানের কথা মনে হতেই শিরশির করে ওঠে তার বুকটাও।

একদম একা সে, শিকারের ইচ্ছেটা এখন আর তেমন চাগাড় দিয়ে ওঠে না ভিতরে। তবুও রাধার কাছ থেকে শোনা ইস্তক আবার ডাকাবুকোর মতো ডিঙি ভাসিয়ে একটা শিকার ডিঙিতে তুলে আনার নেশায় সে পাগল হয়ে গিয়েছিলো। তার নতুন বিয়ে করা বউ রাধা তার কাছে হরিণের গল্প শুনে

আবদার করে, তাই নিকি গো, তা আনো না আরেটাদিন একটা হরিণ মেরে। রসিয়ে রসিয়ে খাই। চিনিবাস প্রথমটা এড়িয়ে যেতে চায়, কতোদিন আর সে জঙ্গলমুখো হয়নি, তাছাড়া সঙ্গী সাথীরা এখন কে কোথায় আছে তাও জানা নেই। কিন্তু রাধা ক্রমে নাছোড়বান্দা, পরে মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'হু, জানা আছে মুরোদ কতোটা। উসব গল্প বানিয়ে বানিয়ে সব্বাই বলে।'

তখন শিরার ভিতরটায় আগুন খেলে যায় চিনিবাসের। বিয়ে-করা নতুন বৌ, তার একটা আবদার যদি সে না রাখতে পারে তবে কিসের মরদমানুষ সে। ভিতরে বুকটায় একটা চিড় খেয়ে যায় তার, 'তালি যাও, আনতে পারি কিনা।'

জঙ্গলের খাঁড়িতে ডিঙির ওপর উবু হয়ে ঠায় বসে থাকতে থাকতে মনে হয় তার, ঝোঁকের বশে চলে এয়েছে সে এতোটা দূর, এখন এই গহীন জঙ্গলে হরিণের দেখা মিলবে কিনা কে জানে। আগে কতো কতো দিন হরিণের কলজের সাথে মোকাবিলা করেছে সে। তখন হরিণের নাম শুনলিই রক্তের ভেতরটা চনমন করে উঠতো তার।

ভাবতে ভাবতে বেলা গড়ায়, বেশ ঘন হয়ে ওঠে বিকেলটা, এ তল্লাটে হরিণের আনাগোনা যে আছে এ খবর তার জানা। কিন্তু দু-একদিনের ভেতর বড়মিঞারা যদি এদিক পানে চরে থাকে, তাহলে তো চিত্তির। কিনারের চরটা সে ভালো করে ঠাহর করতে থাকে, কোনো থাবার দাগ চোখে পড়ে কিনা। হঠাৎ গায়ের ভেতরটা আরেকবার শিরশির করে ওঠে। কি জানি আশেপাশে কোথাও তেনারা শরীর লুকিয়ে বসে আছেন কি না।

যখন সন্ধে হবো-হবো, দিনের আলো তার ডানা মুড়ে ফুসলিয়ে নিয়ে এলো অন্ধকারকে, তখন বেশ মুষড়ে পড়ে চিনিবাস, শিকার না মিললে তার অনেক দুর্ভোগ আছে কপালে। হরিণ না নিয়ে খালি ডিঙি ফিরলে আরো দুয়ো দেবে রাধা, 'অঃ এই তো মুরোদ।' থেকে থেকে সাত-পাঁচ চিন্তায় তার ভিতরে ভিতরে তোলপাড় হয়। ডিঙি থেকে একলাফে চরে নেমে জঙ্গলটা চুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় তার। কপালের রগদুটোয় একটা রাগ আর যন্ত্রণা একসাথে দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে।

হঠাৎ কাছের ঝোপেঝাড়ে সরসর্‌ শব্দ শুনে চমকে ওঠে সে, টানটান হয়ে ওঠে তার হাত-পা, বুঝতে পারে তার লোমকূপের ভিতর থেকে যেন লোম ফুঁড়ে উঠছে খে হয়ে। সরসর শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে তার দিকে, কান খাড়া

করে বুঝতে পারে এটা হরিণ না হয়ে যায় না। আরি বাপ্, তবে তো তার পোয়া বারো। রাধার কাছে তার মুখ দেখানোর জো হলো বুঝি। তার চোখটায় শকুনের মতো ছোঁ, যেন নিমিষ যেতে না যেতে একটা নধর হরিণ সে গিঁথে ফেলতে পারে। হাতের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে, কানটা যেন অলক্ষ্য পায়ের শব্দের সাথে জঙ্গলের ঝোপঝাড় ঠেলে ঘোরাফেরা করছে একনাগাড়ে।

ঠিক সেই সময় জঙ্গল চুঁড়ে আসা একটা শাদা ধবধবে হরিণ একেবারে তার নাগালের ভিতর এসে দাঁড়ায়. চোখ দুটো তার আগুনের গোলার মতো হরিণটার দিকে, কেবল মাত্র হরিণটার দিকেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। তার হাত দুটো চনমন করে ওঠে আগের মতো। যেন আঠারো বছর বয়সের সেই হানফেনে স্বাদটা অবোর তার কলজের মধ্যে ভর করেছে।

হরিণটা তার দিকেই চেয়ে আছে, একচুলও নড়ছে না। সেও পলকহীন হয়ে চেয়ে আছে হরিণটার চোখ দুটোর দিকে, কিন্তু আশ্চর্য, একমুহূর্ত তার দেরী হয়ে যায় নধর হরিণটাকে গিঁথে ফেলতে, আর সেই অবসরে তার ঠাহর হয়, হরিণটা প্রচণ্ড বেগে হাঁপাচ্ছে, তার নধর শরীরটা কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। আর চিনিবাসের হাতের যন্তোরটা দেখেও সে একচুল নড়ছে না তার জায়গা থেকে।

আর সেই এক পলকেই চিনিবাসের খেয়াল হয়, হরিণটা ভয়ার্ত, তার চোখ দুটো দেখলেই জঙ্গল-করা যে-কোন মানুষই বলে দিতে পারে বাঘের তাড়া খেয়ে সে এখন অন্য কোন আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে এসেছে ঝোপঝাড় ঠেলে। মুহূর্তে থেমে গেলো চিনিবাস, একবার মনে হলো রাধা মুখ বেঁকিয়ে তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলছে 'ছুয়ো, ছুয়ো।' দাঁতে দাঁত চেপে তবু সে ভাবলো, হরিণটা আশ্রয় প্রার্থী তার, নিশ্চিত মরণের হাত থেকে পালিয়ে এসে এখন তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। চিনিবাসের হাত দুটো নেমে এলো আস্তে আস্তে।

চাবুক

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

ফিটন ছুটতো। চাকা দেখা যেত না। ঘোড়ার খুড়ে ধুলো উড়তো।

কে যায় রে? —কেউ জিজ্ঞেস করলে, আরেকজন বলতো, চুপ। দেবেন্দ্রনাথ।

কথাটা ঘোড়ারও কানে যেত। ঘোড়া আরো জোরে ছুটতো। আরো ধুলো উড়িয়ে। সন্ধ্যা গাঢ় করে দিত।

কি দাপট।

হ্যাঁ, দাপট। যেমন দাপট, তেমন দেমাক।

বাংলাদেশে দেবেন্দ্রনাথ দুটো জন্মায়নিরে শালা। দেখে নে। লোকের মুখ চোখ দেখে দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে বলতেন।

'আবে চোপ রও' কখনো কাউকে মুখে বলতে হয়নি। বলেন নি কখনো। আশপাশের মানুষগুলি আপসে চুপ মেরে থাকতো। মুখ দিয়ে রা করতো না। যে করেছে সে ভিটে ছাড়া হয়েছে।

দিন ছিল। তখন যা খুশি তাই করেছেন দেবেন্দ্রনাথ। মানুষকে মানুষ বলে মনে করেন নি। মানুষ কিনেছেন, মানুষ বিক্রি করেছেন, টাকার গরমে পা পড়েনি মাটিতে। টাকার দাপটে পাইক পেয়াদা লেঠেল পুষেছেন দেবেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষরা। তাদের অবশিষ্ট যা পেয়েছেন তিনি, তা-ই বা কম কি?

ঘটনাটা দেবেন্দ্রনাথের এখনো মনে পড়ে মাঝে মাঝে। দেবেন্দ্রনাথ রেগে গেলে বাইরে তার কোন প্রকাশ দেখা যায় না। ভিতরের মানুষটা যত রাগে, বাইরের মানুষটা তত শান্ত শীতল দেখায়।

তারকনাথ বাড়ুজ্যে দেবেন্দ্রনাথের বিপক্ষে সাক্ষী দেবে আদালতে। আগেই সন্দেহ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, বেটা নাকি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। জীবনে নাকি মিথ্যে-ফিত্যে বলেনি কখনো।

দেবেন্দ্রনাথ অন্যের জেদ পছন্দ করেন না। কখনো করেন নি।

দেবেন্দ্রনাথের চর আগের দিন রাতে গিয়েছিল তারকনাথের বাড়ি। বলে

এসেছিল, ভেবেচিন্তে কথা বোলো কোর্টে। কার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ মনে থাকে যেন।

তারকনাথ বাড়ুজ্যে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, ভেবে দেখবো।

তারকনাথের ভিটে নিয়েই মামলা।

পেয়াদারা চোখের আড়ালে চলে যেতেই তারকনাথের মেয়ে সুমতি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ওদের সামনে বেরোয়নি। আড়াল থেকে দেখেছে, সব শুনেছে, লোকগুলি কি নোংরা। সুমতির বয়স হয়েছে। এ বয়সে বাইরের লোকের সামনে আসতে নেই। তাছাড়া লোকগুলি তো ভাল নয়। বাবাকে বললো, সব শুনেছি বাবা, কাল তুমি কি করবে ঠিক করেছ।

—ভাবছি আদালতে যাব কিনা।

—যাবে না কেন? সুমতি রুখে দাঁড়ায়।

—ওদের সঙ্গে আমরা পারব কেন?

—তাই বলে চুপ করে থাকবে? পালিয়ে থাকবে? একটা শয়তান বজ্জাত লম্পটের ভয়ে।

শয়তান বজ্জাত লম্পট বলেই তো ভাবছি। ভালো মানুষ হলে তো ভাবার কিছু ছিল না। তাছাড়া তোর কথাও ভাবছি দিনরাত।

—আমার কথা ভাবতে হবে না। কোনদিন তো মিথ্যে বলোনি। কারোর ভয়ে পালিয়েও যাও নি। কাল তোমাকে কোর্টে যেতে হবে। সত্যি কথাই বলতে হবে।

—এর পরিণাম কি হবে জানিস?

—যা হয় হবে।

দেবেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে আছেন। হাতে গড়গড়ার নল। মাঝে মাঝে মৃদু টান দেন। অন্ধকারে কারা যেন বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। কাকে জোর করে ধরে নিয়ে এলো। হাত মুখ বাঁধা।

ধরে এনেছি হুজুর।

দেবেন্দ্রনাথ চোখ তুলে একবার তাকান। —কাকে ধরে এনেছিস? মোলায়েম অনুত্তেজিত, শান্ত কণ্ঠস্বর।

তারকনাথের মেয়ে সুমতিকে। এই বজ্জাত মেয়েছেলে তারকনাথকে বুদ্ধি দিয়েছে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। দেবেন্দ্রনাথ আর একবার তাকালেন। সেই

শান্ত দৃষ্টি। —এ কি, করেছিস কি তোরা? ওকে তো ডেকে আনতে বলেছি। তোরা বেঁধে নিয়ে এসেছিস? ছি। খুলে দে। আহা, কি নাম তোমার খুকি।

হাত মুখ খুলে দেয় সুমতির। রাগে অপমানে জ্বলে যায় সুমতির শরীর। —একটা মেয়েকে রাতদুপুরে তার ঘর থেকে চুরি করে আনতে লজ্জা করে না?

—তুমি রাজনীতি করো? কি রকম কথা বলছ যেন!

—না, করি না। করলেও আপনার কি?

—তোমার বাবাকে নাকি কি সব বিপ্লবের কথা শোনাও।

—মানুষের অধিকারের কথা বিপ্লবের কথা কিনা আমি জানিনা।

—আমি জানি, ওটাই বিপ্লবের কথা। তুমি তো মেয়েছেলে। লেখা-পড়াও শেখোনি খুকি। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন দেবেন্দ্রনাথ। কণ্ঠস্বরে স্নেহ ঝরে। নিমাই-চৈতন্য ভাব। হাতে জপের মালার বদলে গড়গড়ার নল, মাঝে মাঝে ঠোঁটে ছোঁয়ান। কাজটা তুমি ভালো করোনি খুকি। আমাকে যদি কেউ গুণ্ডা বলে, আমি রাগ করি না। কেউ যদি খুনী বলে, আমি রাগ করি না, আসলে কি জানো, রাগ আমার শরীরে নেই। আমার পূর্বপুরুষের রক্তেও রাগ ছিল না। আমি খুব শান্ত নিরীহ মানুষ।

আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি, খুকি। তুমি আমার বিরুদ্ধে তোমার বাপকে লেলিয়ে দিচ্ছ। এরপর ঝাণ্ডা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। পিছনে তোমার মত অশিক্ষিত কতগুলো ছেলেমেয়ে চিল্লাবে, ও সব আমার ভালো লাগে না। আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি।

—না। আমাদের বাস্তুভিটে থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি ওখানে বেশ্যা-পল্লীর ব্যবসা খুলবেন, অথচ আমাদের কোন ক্ষতিই করলেন না। কি চমৎকার ভালো মানুষ আপনি। রাগে থর থর কাঁপে সুমতি।

—দেবেন্দ্রনাথের চোখে হাসি। যদি চাও, সেখানে একটা চাকরীও পেতে পারো। আমি তো তোমার ওপর অবিচার করতে পারি না। তুমি এখন বাড়ি যাবে খুকি?

—আমি খুকি নই।

—তুমি সত্যিই খুকি। তাই যা সত্যি তা তুমি জানো না। কার সামনে দাঁড়িয়ে আছো, তাই জানো না।

—জানি। আপনি মাতাল, লম্পট। রাত্রে মেয়েদের চুরি করে আনেন। তাদের অপমান করেন।

তুমি খুকি তেমন মেয়েছেলেও নও। তোমাকে আমি ছোঁব না। তেমন সৌভাগ্য তোমার হয়নি এখনো।

—কি চান আপনি?

—কিচ্ছু না। তুমি নাকি খুব সাহসী। একবার দেখতে ইচ্ছে হলো, তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। এবার তুমি যেতে পারো।

সহচররা হা হয়ে যায়, তাকিয়ে থাকে দেবেন্দ্রনাথের নির্লিপ্ত চোখের দিকে।

সুমতি দরজার দিকে পা বাড়ায়।

আহা শোন। বাইরে অন্ধকার। তোমার সাহস থাকলেও আমি তো বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। আজকের রাতটা আমার দারোয়ানদের ঘরে থাকো, কাল সকালে চলে যেও।

—না। আপনার দারোয়ানদের ঘরে আমাকে ঠেলে দেবেন না।

—আমার ঘরে থাকবে? তাতো হয় না। ওরা তোমাকে ভালোভাবে রাখবে।

তোদের ঘরে নিয়ে যা। একটু আদর যত্ন করিস। যা নিয়ে যা। তোরা এনেছিস যখন, তোরাই নে। দেবেন্দ্রনাথের শান্ত কণ্ঠস্বরই বজ্রপাতের মত নির্দেশ।

দেবেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন।

কি হলো এসব করে। তারকনাথ ভিটে ছাড়া হলো। ওর মেয়ে সুমতি সেই রাতের পর আর বাড়ি ফেরেনি।

আসলে দেবেন্দ্রনাথ কোনদিন কারো দেমাক সহ্য করতে পারেননি। অথচ নিজের দেমাক বজায় রেখেছেন পুরোমাত্রায়। সেই দেমাকের আগুনে দেবেন্দ্রনাথের বাড়ি ঘরও একদিন চলে গেল।

কিছুই চিরকাল কারো থাকে না। ওই জমিতে কত লোকের পূর্বপুরুষ নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই বুঝি মাটির শর্ত। এই মাটি কারো না। মাটি মাটির। এই মাটির দখল নিয়ে তারকনাথ খুন হয়। সুমতি ঘর ছাড়া হয়। দেবেন্দ্রনাথ দাস্তালকেও একদিন সরে দাঁড়াতে হয়।

এখন দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সেদিন হঠাৎ টেলিগ্রাম এলো বোম্বে থেকে। ছোটছেলে নবীন্দ্রনাথ ট্রেন এক্সিডেন্টে মারা গেছে। দেবেন্দ্রনাথ কেঁপে উঠলেন। মৃত্যু এর আগেও দেবেন্দ্রনাথ দেখেছেন। এখন,

এই ক'বছরে একটু ঘন ঘনই দেখছেন। কিন্তু এভাবে তাঁকে আর কোন মৃত্যু হাড়মাংসে কাঁপন ধরায় নি। এখন তার একটাই প্রশ্ন পোকা হয়ে মাথার মধ্যে কুড়ে খাচ্ছে।—মৃত্যু কি?—মৃত্যু কেন? কদিন আগেও একবার এই প্রশ্ন উঁকি দিয়েছিল। ঈশ্বর-প্রতিম সহোদর যখন মারা গেলেন।

এক একটা মৃত্যু দেবেন্দ্রনাথকে ভেঙে দেয়। বয়স বাড়িয়ে দেয়। এক সময় ছিল, যখন দেবেন্দ্রনাথ বয়স বিশ্বাস করেননি। এখন একটু একটু করে বিশ্বাস করছেন।

—চাপা আছে, চাপা?

—চাপা?

—হ্যাঁরে, চাঁপাসুন্দরী দাসী। এ তল্লাটের রাণী। বল গিয়ে বর্দ্ধমানের দেবেন্দ্রনাথ সান্যাল এসেছেন।

লোকটা বিমূঢ়। তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। সে তো এখন···আমতা আমতা করে কি বলতে চায়।

তারপর কি বুঝলো সে-ই জানে। দ্রুত উধাও হলো। দ্রুত ফিরে এসে ডাকলো, আসুন আমার সঙ্গে।

তারপর সারারাত চাঁপার ঘরে।

—তুই এতো বুড়ি হয়ে গেছিস, কারবার ছেড়ে দিলি নাকি।

চাঁপা হাসে। বলে, আমি তো তোমার মত পুরুষমানুষ নই গো যে সত্তর বছরেও যৌবন নিয়ে ঢ্যাং ঢ্যাং করে ঘুরে বেড়াবো।

চাঁপার সামনে বসে দেবেন্দ্রনাথের বয়স অনেক কমে গিয়েছিল। বুকে বাতাস খেলেছিল। জানালাগুলি খুলে গিয়েছিল। ফুল ফুটেছিল।

চাঁপার ঘর থেকে যাবার সময় এক গোছা নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, এগুলো রাখো।

টাকা দিয়ে কি হবে?

তোমার দাসদাসীদের দিও। ওরা নিশ্চয়ই জানবে আমি এসেছিলাম। যখনই এসেছি, ওদের না দিয়ে যাইনি।

শরীর ছাড়াও শরীরের মধ্যে কি যেন আছে। না হলে চাঁপা বুড়ি হয়ে গেছে, দেবেন্দ্রনাথ তার ঘরে সারারাত কাটিয়ে দিল গল্প করে? শুধু গল্প করে। একবার বোধহয় চাঁপার শীর্ণ আঙুলগুলি নিজের হাতের মুঠোয় তুলে হাত

বুলিয়েছিল, চাপ দিয়েছিল। চাঁপার কি মনে হয়েছিল। বলেছিল তুমি কি ভেবে এয়েছ আমি এখনো সেই ভাগর কচি লেবুটি আছি। রসও পাবে, গন্ধও পাবে? দেখ, এখন আর কিচ্ছু নেই শরীরে। চাঁপা নিজের হাত বাড়িয়ে ধরেছিল দেবেন্দ্রনাথের চোখের সামনে। বলেছিল, কাউকে এনে দেবো। এই বাড়িটাই তো এখন আমার। তোমারই পয়সায় কেনা।

—না, কাউকে চাই না। তোমাকে দেখতে এসেছি। সেদিন দেবেন্দ্রনাথের অন্ধকারের ওপর রুচি হয়নি। সেদিন দেবেন্দ্রনাথের বয়স কমে গিয়েছিল। খিল খিল শব্দ করে হেসে উঠেছিল। নিজের হাসির শব্দে নিজেই পুলকিত হয়েছিল। বলেছিল, আমার পছন্দ তোর মনে আছে? আমার পছন্দ তো একজনকেই। অন্যের কথা বলছিস কেন?

—তোমার হাসিটা পাল্টায়নি দেখছি।

—কি কি পাল্টেছে?

কিছুই পাল্টায় নি। চাঁপা খুশি হয়ে বলে, তুমি সেই মানুষটাই আছো।

নবীনের কথা মনে হলেই আর সব কথা তলিয়ে যায়। সব কিছু। বরং মনে হয়, কখনো কখনো মনে হয় তাহলে আমি কেন আছি? আমারই বা আর থাকার প্রয়োজন কি? শুধু দেখার জন্য? এই সব দেখার জন্যে? আরো কি কি দেখতে হবে? যদি এমন চলে যাওয়া, তা হলে এমন থাকাটাই বা কেন? এই যাওয়া আর থাকার কোন নিয়মকানুন নেই! নাহলে নবীন চলে যায়, আমি থাকি। এই সব ভাবতে ভাবতে দেবেন্দ্রনাথের আবার বয়স বাড়তে থাকে।

নিজের হিসেব-পত্রের খাতা নিজের কাছেই। উল্টে পাল্টে একা একাই দেখে। যারা দেবেন্দ্রনাথকে জানে তারা টুকরো টুকরো জানে। কেউ সব জানে না একা দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া। দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। ঝাপসা চোখেও নিজেকে পড়তে পারেন।

মানদা দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী। একদিন কি পাইজামিতে পেয়েছিল দেবেন্দ্রনাথকে। ঘরের দরজা বন্ধ করে মানদাকে জোর করে মদ গিলিয়েছিল। মানদা নোংরা গন্ধটা সহ্য করতে পারেনি কোনদিনই। তাই জোর করে ওর গলায় ঢেলে দিয়েছিল। খেতেই হবে। বিষ দিলেও আমি দিচ্ছি, আমি তোমার স্বামী। আমার হাতে বিষও তুমি খেতে পারো।

—কি পাগলামি হচ্ছে। আমি এই গন্ধ সহ্য করতে পারি না। বৌকে মদ খাইয়ে স্বামীগিরি ফলাচ্ছো। যে মেয়েরা খেতে পারে তাদের কাছে যাও।

তাদের গিয়ে খাওয়াও।

—না, তুমিও খাবে। —কি এখন খারাপ লাগছে? অনেক কথাই দেবেন্দ্রনাথের মনে পড়ে। নেমে পড়তে যা সংশয়। কষ্ট। একবার নেমে যেতে পারলে আর কোন সংশয় থাকে না।

মানদা বলেছিল, হ্যাঁ, খুব খারাপ লাগছে।

তাহলে আরো খাও। এটা খেলে পৃথিবীতে খারাপ লাগার মত আর কিছু থাকে না। সকলের থেকে আলাদা হওয়া যায়। লজ্জা ঘৃণা সঙ্কোচ বাজে সভ্যতাবোধ—কিছু থাকে না।

দেবেন্দ্রনাথ পৃথিবীর সবকিছু থেকে এইভাবে এখনো মাঝে মাঝে আলাদা হয়। সব ভালোমন্দ বোধ বিবেচনা থেকে সরে দাঁড়ায়।

এতো বড় বাড়িটা আজ ফাঁকা। বিরাট একটা শূন্যের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছে। হুহু করা বাতাস দেয়ালে দেয়ালে আছাড় খায়। মানুষ নেই। বাতাস কারো গায়ে লাগে না। কার গায়ে লাগবে? মানদাও তো চলে গেছে অনেকদিন হলো।

মানদাই বা কতটুকু জানতো। আজ মানদাকে অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছে দেবেন্দ্রনাথের। দেবেন্দ্রনাথের মনে সেদিন কোন পাপবোধ ছিল না। কোন অপরাধবোধ ছিল না।

লক্ষ্মী যা জানে, মানদা তা জানতে পারেনি।

দেবেন্দ্রনাথের মেজ মেয়ে লক্ষ্মী। বাড়ন্ত শরীর। কদিনের জন্য মানদা বাড়ি ছিলেন না। বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা থেকে নিজের ঘরে বসে মদ্যপান করছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। মদ গিলতে গিলতে রাতদুপুরে মাথায় ভূত চাপলো। দোতলায় লক্ষ্মীর ঘরে গিয়ে খিল তুলে দিলেন। লক্ষ্মী তখন ঘুমে। যখন ওর ঘুম ভেঙে গেল, চমকে উঠলো লক্ষ্মী, বললো, একি বাবা, তুমি এ ঘরে কেন? তুমি ঘুমোও নি?

—তোর কাছে এলাম। তোর কাছে শোব।

—ছি বাবা, তুমি তোমার ঘরে যাও।

—তোকে কতদিন দেখি না।

—সারাদিন দেখছো, এখন যাও। শুয়ে পড়ো গিয়ে।

লক্ষ্মীকে ধরতে হাত বাড়াল, লক্ষ্মী ছুটে সরে যায়।

—বাবা, তুমি একটা কেলেঙ্কারী করবে দেখছি। তোমার কি মাথা খারাপ

হলো ? বাবা বাবা বাবা, ঘরে যাও।

আমার মাথা খারাপ হয়নি। দেবেন্দ্রনাথের সম্বিত ফিরে আসে। নেশা ফিকে হয়। —তোর বয়স কুড়ি বছর কমে গেছে আমার কাছে। তুই আমার কাছে পাঁচ বছরের খুকুই আছিস। সেই পাঁচ বছরের পর তোর বয়স এক দিনও বাড়েনি আমার কাছে। তুই আমার কাছে না শুলে ঘুমুতিস না। ভুলে গেছিস ? আমার কেন মনে হলো, তোর ঘুম হচ্ছে না, পাশে শুলেই তোর ঘুম আসবে। তাই চলে এলাম। আজ তোর কাছে তোর শরীরটা অনেক বড় হয়েছে নারে ? তোর বাপ কি এতই ছোট, তোর কাছেও।

না বাবা। আমার ঘুম হচ্ছে। চলো তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

না। আমি একাই যেতে পারবো। দরজায় খিল দিয়ে শো। তোর বাপ মাতাল। মাতালের মাথা ঠিক থাকে না। মাথা নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ।

লক্ষ্মীকে যা বলে থাকুক, দেবেন্দ্রনাথ জানে সে সব মিথ্যে কথা বলেছিল। দেবেন্দ্রনাথের কাছে লক্ষ্মীর বয়স পাঁচ বছর ছিল না, পঁচিশ বছরই হয়েছিল। পঁচিশ বছর বয়সের আগুন দেবেন্দ্রনাথের মন থেকে পিতাকন্যা সম্পর্ক পুড়িয়ে দিয়েছিল।

এমনি অনেক, অজস্র ঘটনা। তখন যা ছিল ছোট ছোট, তুচ্ছ, এখন তা ছোট তুচ্ছ মনে হচ্ছে না। মানদাকে সব কথা বলা দরকার ছিল। এসব কৃতিত্বের কথা শুনে মানদা খুশি হতো না। না হোক, দেবেন্দ্রনাথ তো খানিক বোঝা নামাতে পারতো তার বুক থেকে। তাহলে বুকে আজ এতো ব্যথা হতোনা।

বুকে ঠিক কোথায় ব্যথা বুঝতে পারেন না। এ ব্যথা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, মুখ খুলে কাউকে বলা যায় না।

এখন প্রায়ই এই ব্যথাটা অনুভব করেন।

মানদা তার শরীর নিয়ে চলে গেছে। গিয়েও কি যেন রেখে গেছে।

এক সময় দেবেন্দ্রনাথের মনে হতো শরীরই সব। সব সময় শরীর খুঁজে বেড়াত। এখন সেই শরীরশুদ্ধ মানুষগুলি তাঁকে ঘিরে থাকে সব সময়। শরীরের মানুষগুলিকে সব সময় দেখতে পান না। তাদের সব কথা কানেও পৌঁছয় না।

এখন তার বারবার মানদাকে মনে পড়ে। মানদাকে বলতে ইচ্ছে করে, নিজে তো বেশ চলে গেলে বজ্জাতি করে। আর কটা দিন থাকলে কি হতো ? আমি একা একা এ এসব কি দেখছি ? আর কতোদিন দেখবো ? আমার বয়স, আমার অপরাধ আমাকে কী ভীষণ মারছে তুমি দেখতে পেলে না।

ছলমলিয়ার মূলধন

জহর সেনগুপ্ত

ডুম-ডুম-ডুম ঢোল বাজনা বাজিয়ে লোক ডাকে। গলির ফাঁক-ফোকর থেকে খালিগায়ে পাছার হাড়ে ঝুলে থাকা ইজের একহাত টেনে রেখে বুড়ো আঙুলের ডগা চুষতে চুষতে কয়েকজন এলেবেলে এসে দাঁড়ায়। সকলের চোখ বাজনদারের পিঠের ঝোলাটার ওপর। ও বাজিয়ে চলে আর পায়ে পায়ে বৃত্তটাকে বাড়িয়ে চলে। একসময় ভিড় বেড়ে যায়। লখিয়া কাঁধের বোচ্‌কা বৃত্তটার ঠিক মাঝখানে নামিয়ে তার পাশে বসে পড়ে। এদিকে ছলমলিয়া আর বাচ্চা ছেলেটা দু'জনে মিলে বাঁয়ের লগির সাহায্যে খুন্তে দড়ি খাটাতে লেগে যায়। মানুষ-জনের বৃত্তটাকে উদ্দেশ্য করে লখিয়া বাজনা থামায় এবং শেষবারের মত একটা ছোট্ট ভাষণ দেয়, "সার্কাস খেলা দেখে দু'-পাঁচটা পয়সা দিয়ে তিনটে পেট বাঁচান।" লোক জমিয়ে ফেলেছে। এবার শরীরের কসরৎ দিয়ে মাৎ করবে ছলমলিয়া। মাঝে সাজে বাচ্চাটাকে কাজে লাগাবে যে ওদের কারো নয়। ওরা তিনজন কেউ কারো নয়, রোজকার হিসেবমত যে যার পাওনাগণ্ডা বুঝে নেয়, তবু এই ছোট্টদলটার মালিক লখিয়াই, সে-ই ছলমলিয়াকে এনেছে, বাচ্চাটা জুটিয়েছে রাস্তা থেকে, বয়স বছর বারো।

ছলমলিয়া কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে দেহের সাথে আঁটোসাটো করে নেয়। যাতে সকলের চোখে শরীরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যারা দেখতে চায় তাদের চোখে, পাঁচ-দশ পয়সার বদলে মাঝে মধ্যে আধুলি সিকিটাও পড়া চাই, খেলা ত সকলেই দেখবে, বালবাচ্চা থেকে সব্বাই, কেউ কেউ পাঁচ-দশ পয়সাও দেবে কিন্তু আধুলি-সিকি যারা দেবে তারা উপরি কিছু চাইবেই, নইলে কেন দেবে। —কিন্তু আধুলি-সিকিটা না পড়লে পড়তায় পোষায় না, গত্তর টেঁকেনা, আর গত্তরটাকে চাঙা না রাখলে কিসের জোরে খেলা দেখাবে। গত্তর না বাঁচলে খেলাও আর বাঁচবে না। ও তা জানে আরো একটু বেশি জানে কেবল দুঃসাহসী খেলা দেখে বাবুরা পয়সা দেয়না সাথে গত্তরটাকে চেখে নেয়, শরীরটা এমন টানটান বলেই না লখিয়া—"মা-র রক্ত-বমির সময় কিছু টাকা দিল, ওকে দলে ভিড়িয়ে নিল।

লখিয়ার বউটা লখিয়ার থেকে বছর আষ্টেক বড় ছিল, তার ওপর রোগ

ধরেছিল। হাঁপিকুগি, বুক চেপে দম নিত। এ অবস্থায় আসর জমাতে পারত না। খেলা শেষ হতে না হতে ও কাহিল হয়ে পড়ত। শরীরের চকমকি ভাবটার ওপর কালচে প্রলেপ পড়েছিল, একটু দাঁড়িয়েই বাবুরা যে যার কাজে সটকে পড়ত। বালবাচ্চাদের ভিড়ই ঘিরে থাকত চত্বরটা। দু-পাঁচ পয়সা যা পড়ত হাততালি তার দশগুন, কোন কোন দিন পয়সার অবস্থা দেখে রেগে-মেগে লখিয়া দাঁত কামড়ে সকলের তালির আওয়াজ ছাড়িয়ে তালি বাজিয়ে হারিয়ে দিতে চাইত। একসময় সকলে তালি থামিয়ে চেয়ে থাকত ওর মুখের দিকে—বিভৎসভাবে পুরু ঠোঁট ছড়িয়ে দাঁত কামড়ে তালি বাজিয়েই চলেছে যেন অনন্ত কালকে এভাবে হারিয়ে দিয়ে তবে ও থামবে। তাই না লখিয়া ছলমলিয়াকে টানল। বাড়ীর উঠনে দু-পা ছড়িয়ে নানা কসরৎ শেখাতে লাগল। ছলমলিয়ার শরীরটা যখন মাথার পেছনে দু হাত ছড়িয়ে বুক চিতিয়ে বেঁকে যেতে থাকে লখিয়া ওর কোমর ধরে প্যালা রাখে—জানালায় বুড়ি বউটার ছলছল তাকিয়ে থাকা এক ঝলক দেখে ছলমলিয়া লখিয়ার কাছে শরীর সঁপে। খেলা শেখায় মন দিয়ে। যেমন বলে তেমন বেঁকে যায় একটুও নড়চড় হয় না। ক্ষেপে গেলে লখিয়া দাঁত ভেঙচে খিস্তি করে উঠবে, তবুও যখনই মনে হত খানিক তফাতে একজোরা চোখ থেকে ওর উদ্দেশ্যে অমঙ্গল ঝরে পড়ছে। ও ব্যালান্স হারাত। লখিয়া প্যালা দিতে আরো জড়িয়ে ধরত ওর শরীর।

শীত এলেই উঠোনের অর্জুন গাছটার শুকনো পাতা ছড়িয়ে যেত বাড়ীময়। ছলমলিয়ার ঝাঁট দিতে দিতে ভীষণ রাগ হত। ও ভুলে যেত শেষ বর্ষায় গাছটা কিরকম টাটকা সবুজ ছিল ও হাঁপিয়ে উঠত ঝরাপাতার রাশ সরাতে সরাতে। শেষে একদিন রেগে কুড়ল দিয়ে কুপিয়ে দিল গাছটা। ও এরকমই। ঐ বুড়ির জন্যই ওর লখিয়ার ওপর টান বেড়ে যায়। ও লখিয়ার সুখ-সুবিধাও দেখতে লাগল।

সারাদিন খেলা দেখাবার পর প্রথম প্রথম যা দিত তাই নিত ভাগের কোন দাবী করত না, যাবার সময় লখিয়ার সাথে রঙ্গরস করে ঢলে পড়তেও কসুর করত না, লখিয়া খেলার আসরেই ওর টানটান শরীরের কসরতে কেমন তাজ্জব বনে যেত, "ছলমলিয়ার শরীরটা অবরদস্ত বলেই কসরত বেশ খোলতাই হয় আর বাবুরা পয়সা ছোড়ে" তা লখিয়া অনুমান করে। আর বাবু ত বাবু খেলা দেখার সময় সেও যেন কেমন হয়ে যায়, নিজের কাজটা যদি পয়সা কুড়োবার না হ'ত তবে সেও ট্যাঁক খসিয়ে ছুঁড়তে কসুর করত না।' তাই রঙ্গরসের ফাঁক-

ফোকরে ঢলে পড়লে সে তার প্রতিউত্তর দিত।

শীতের বেলা ফুরুৎ করে ফুরিয়ে যায়। দু-তিন জায়গায় বেশি আসর বসানো যায় না। তাতেই শহর ছাড়তে না ছাড়তে সন্ধো নামে, ছেলেটাকে পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে ছেড়ে দিয়ে ছলমলিয়াকে পাশে নিয়ে শহর ডিঙিয়ে গায়ের পথের মাঠ ভাঙে আর মাঝে মধ্যে রঙরস (দেখছিলে ত বাবুটা কেমন হাঁ করে আমার দাঁড়ির ওপর হাঁটা দেখতে দেখতে বসে পড়ে আর মুখ তুলে আকাশ দেখার ভান করছিল, তারপর একটা দু'টাকার নোট ছুঁড়ে দিল আমার বুক বরাবর)। হ্যাঁরে হাঁ তোর খেলাকে না দিক বাবুরা তোর বুককে না দিয়ে যাবে কুথায় বল। ও দিয়েত পাথর বুকে জল গড়াস, বাবুরা তোর খেলা না দেখে যাবে কোথায়। পথে ঘাটে ঘুরলেও হরবকত এমন চিজ মেলে না,…অন্ধকারে ছলমলিয়া কাঁধে স্পর্শ অনুভব করে একটা চাপ ওর কাঁধে আবার চেপে বসে। যেতে যেতে টেনে নেয়…এসবে প্রতিবাদ ও করে না, সব বোঝে। লখিয়ার কাছে একটা শরীর। ভেঙে-দুমরে পরে আছে বলেই আর একটা শরীর নিজেকে টিকিয়ে রাখার রসদ পাচ্ছে, নইলে এই ছলমলিয়াই কি অকালে টসে যেত না; তার নিজের জন্যও নিজের কিছু করার ছিল না। তারওপর আজকাল মাঝে মধ্যে ও লখিয়ার ওপর ফুসে ওঠে, ভাগবাটোয়ারা বুঝে নিতে চায়, লখিয়াও কলহ করেনা, ভাগ ওকে ঠিকঠাক দেয় উপরন্তু চা-নিমকি নিজের ভাগ থেকে খাওয়ায়, শুধু মাঝেসাঝে টানা হেচড়ার সময় ও কেমন এলিয়ে পরে—মনে মনে বেশ বুঝতে পারে। ওর শরীরটা মোহ বিস্তারের জন্য যথেষ্ট, শরীর নাচিয়ে ও হাটেগঞ্জে বাবুদের চোখের নাচন দেখেছে কাজেই ও গতরের মর্ম হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছে।

রোজকার থেকে আজ ওদের গাঁয়ে ফিরতে একটু দেরীই হ'ল। ছলমলিয়াকে সাথে নিয়েই লখিয়া ঘরের ভেজান দরজায় হাত রাখল। অন্ধকারে ওদের টের পেয়ে খানিক তফাৎ থেকে একটা নেড়ীকুত্তা কেঁদে উঠল…ওরা দু'জনেই চমকে উঠে হস-হাস করল কুকুরটা ঘুরে ঘুরে কেঁদে গেল। পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করে জ্বাললো। দেশলাইএর আগুনে নজরে পড়ল খাটিয়ার কানায় বুক বাঁধিয়ে ঝুলে বুড়ি বৌ এনামেলের তোবরানো লোটা ছুঁয়ে পড়ে আছে তার হাত, যা শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরতে পারেনি। … লখিয়ার হাতের আগুন নিভে যায়। আরেকটা জ্বালাতে চেষ্টা করে। ছলমলিয়া এই অবসরে অন্ধকারে স্থির দাঁড়িয়ে ট্রাপিজে এক পা রেখে আরেক পা শূন্যে তুলে কাপড়টা ঘাগড়ার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব্যালান্সের খেলার মহড়া দিয়ে নিল।

তৃতীয় নয়ন

দিলীপ ঘোষ

গত রাতের বৃষ্টির পর আজকের সকালের আকাশ অনেকখানি প্রসন্ন। সূর্যের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ো পেঁজা তুলোর মত দেখাচ্ছিল। ইন্দিরা আর এক প্রস্থ চায়ের তাগিদ দিতে হোটেলের রান্নাঘরে গেছে। দোতলার বারান্দার রেলিঙে দাঁড়িয়ে আমি এলোপাথাড়ি দৃষ্টি ফেলছি—পাহাড়ী ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়া, ট্রয়ট্রেনের ইঞ্জিনের পেছনহাঁটা, নিচে ফলস-এর পাশে ফুলের বাগানে সাজানো স্যানেটোরিয়াম।

আজ আমরা কালিম্পঙ্ যাব। আট নম্বর ঘরের মণিবৌদির ফ্যামিলির চারজন আমি আর ইন্দিরা। নটার সময় গাড়ী এসে আমাদের তুলে নেবে। টাকাটা বেশী পড়লেও পুরো গাড়িটাই আমরা ভাড়া নিয়েছি। মণিবৌদি একটু মোটাসোটা মানুষ। একটু হাত পা ছড়িয়ে বসতে না পারলে গোটা জানিটাই মাটি। মণিবৌদির মেয়েটা মায়ের হাত পেয়েছে। ওর ওজন দশ বছর বয়সেই চল্লিশ কিলোয় দাঁড়িয়েছে। ছেলেটা সে তুলনায় রোগাই বলা উচিত। ওদের বাবা রঞ্জিৎদার বুকের ছাতি এই মধ্যবয়সেও চৌত্রিশ।

মণিবৌদি হাল্কা সিপার পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠছিলেন। চোখ দুটো ফোলা। বোধহয় ঘুমের আমেজ এখনও লেগে আছে। হাতে ফ্লাস্ক। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন—রোদ পোয়াচ্ছ বুঝি। ওদিকে ইন্দিরাকে দেখলাম নিচে কুকের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে। ডিম সেদ্ধ নামিয়ে এখুনি ওকে চা বানিয়ে দিতে হবে। আমি তো নিজেই বানিয়ে নিয়ে চলে এলাম। আগে জানলে তোমাদের জন্ত আরও দুকাপ বেশী বানিয়ে নিতাম।

আমি হাসলাম। বললাম—মনে আছে তো বৌদি। ঠিক নটায় গাড়ি আসবে। তৈরী থাকবেন।

মণিবৌদি ওর বরের আলসেমির কথা শোনালেন—তোমার দাদা তো এখনও কম্বলের নিচে। দেখি, মুখের মধ্যে চা ছিটিয়ে তোলা যায় কিনা।

নিচে ইন্দিরার গলা শোনা যাচ্ছে। আমি ওর উদ্দেশ্তে বললাম—আমাদের লাঞ্চপ্যাকেট ন'টার মধ্যে রেডি করে দিতে বলো।

এতক্ষণে আমি লক্ষ্য করলাম রেলিঙএ ভর দিয়ে আমার থেকে একহাত

হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন। মণিবৌদির চেয়ে অনেক ছোট, ইন্দিরার চেয়ে বড়। কপালে পূর্ণিমার চাঁদের মত বড় একটা কুমকুমের টিপ। ঠোঁটে ন্যাচারাল কালারের লিপ্‌স্টিক। টানা ভুরু। ডানদিকের কপালে কালসিটে দাগ। চিনলাম আমাদের ঠিক পাশের ঘরের বোর্ডার। নিজেই পরিচয় দিলেন—আমরা আপনাদের পাশের ঘরেই উঠেছি। শুনলাম আজ আপনারা কালিম্পঙ্ যাচ্ছেন। আমাদের জন্য দুটো জায়গা হবে? —বাঙলা কথায় টান আছে। অবাঙালী অথবা প্রবাসী বাঙালী।

কপালের ডানদিকে কালসীটের দাগটা আমি তখনও দেখছিলাম। ক্ষতটা গতকাল রাতের। আমি আর ইন্দিরা তখন আমাদের ঘরে গল্প করছিলাম। পাশের ঘরে দাপাদাপি আর ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ। ইন্দিরা নীচের ঠোঁট কামড়ে আমার দিকে তাকালো—অর্থাৎ ব্যাপারখানা কি? আমি কিছু বলার আগেই দুঘরের মাঝের দেওয়ালে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার ফাঁকে চোখ রেখে খানিক বাদে আমার কাছে ফিরে এল—এ্যাই নারী নির্যাতন। কপাটে চোখ রেখে স্যাখ ভদ্রলোক বউটাকে কি মার মারছে। একেবারে ছোটলোক।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম—ছিঃ লুকিয়ে পরের কেচ্ছা দেখা অভদ্রতা।

ইন্দিরার চোখা জবাব--কে আমার নীতিবাগীশ রে। পুরুষজাতটাই স্বার্থপর। আর একটু বাড়াবাড়ি করলে দেখো এই দরজা ভেঙে বউটাকে রেসকিউ করে আনবো।

একটা কাচের গেলাস ভাঙার শব্দ। কান্নার আওয়াজ একটু উঁচু হয়ে আবার নিচু পর্দায় নেমে এল। ইন্দিরার ভেদ আমাকে দরজার ফাঁকে চোখ রাখিয়ে ছাড়লো। —ডানদিকের কপালে কালসিটে দাগ। এক কান্না ভেজা বিষন্ন মুখ। ইন্দিরার চোখে মুখে ঘৃণা—লোকটা কি ইতর। বিয়ে করা বউকে কেউ অমন করে মারে?

একটু থেমে হাতের একটা বুড়ো আঙুলে অদ্ভুতভাবে নাচিয়ে আবার বলল —বিয়ে করা বউ কিনা আর কেউ কে জানে?

সেই মুখ। ডানদিকের কপালে কালসিটে দাগ। সকালের আলোয় ঠিক সেই মুখখানা খুঁজে না পেলেও মুখখানা চিনলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রমহিলা ওর অসহায়তার কথা বোঝাতে চাইছিলেন—জানেন আজ না হলে কালিম্পঙ আমাদের যাওয়াই হবে না। কাল

সকালে আমরা চলে যাচ্ছি। তারপর কোলকাতায় একদিন কাটিয়ে বোম্বাই ফিরে যাব। ওর ব্যবসায়ের খুব ক্ষতি হচ্ছে কিনা।

ইন্দিরা বিজয়িনীর হাসি নিয়ে কাঁধে ফ্লাস্ক ঝুলিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল। ওকে কাছে আসতে দেখে ভদ্রমহিলা বললেন· ইনি-ই তো আপনার···।

তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে ইন্দিরার সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা···আমি বিশাখা দত্ত। বোম্বাই থেকে স্বামীর সঙ্গে এসেছি। আপনারা তো কালিম্পঙ্ যাচ্ছেন। আমাদের দুজনকে যদি সঙ্গে নেন তাই ওনাকে বলছিলাম।

ইন্দিরা থ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কিছু বুঝে নিচ্ছিল বোধহয়। তারপর একটু হাসি হাসি মুখে বলল···হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবেন। আমি এখুনি মণিবৌদিকে বলছি আমাদের দলে আরও দুজন সঙ্গী বাড়লো। বিশাখার চোখে মুখে খুশী লেপটে রইল।

টুয়েল্‌ভ সীটার ল্যাণ্ডরোভার হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে হর্ণ দিল। মণি-বৌদি গালের মধ্যে পান ঠেলে ছেলেমেয়ে নিয়ে নেমে এলো সঙ্গে রঞ্জিৎদা। বিশাখাও স্বামীর সঙ্গে হাসতে হাসতে গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। ইন্দিরা সামনের সীটে বসবে। বিশাখার ইচ্ছেও তাই। সামনের সীটে ধারে আমি তারপর ইন্দিরা আর বিশাখা। পেছনে মণিবৌদির ফ্যামিলীর সাথে বিশাখার স্বামী। কাসিয়াং-এ গাড়ী থামিয়ে ইন্দিরা সকলের জন্য কচুরী আর শোন্‌পাপড়ি কিনলো। তারপর আবার পাইন দেবদারুর ধার ঘেঁসে আমরা ছুটে চললাম। ডানদিকের সরলবর্গীয় বনের রাজত্ব। বাঁদিকে পাহাড়ী নদীর ভয়ঙ্কর খাদ। ইন্দিরা গান গাইছিল। বিশাখাও গলা মেলালো। ঘণ্টা কয়েকের পথ পেছনে ফেলে গাড়ি এসে দাঁড়াল তিস্তার মিলিটারী ব্রীজের সামনে। একের পর এক গাড়ি ব্রিজে উঠছে। তাই এখানে আমাদের কিছুক্ষণ থামতে হবে। গরম লাগছিল। আমরা সবাই গরম জামা খুলে হাল্‌কা হয়ে গেলাম।

এবারে আমাদের গাড়ি কাঠের তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে আঁকা বাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় পাক খেতে খেতে ছুটলো। এরপর কিছু সমতল মাটি ছাড়িয়ে আমরা এসে নামলাম একটা টিলার নিচে। টিলার ওপর উঠে বিশাখা কয়েকটা ছবি তুললো। আমরা সকলেই ততক্ষণে টিলার ওপর উঠে এসেছি। টিলার নিচে কিছুটা দূর দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা তিস্তা। নূপুরের নিক্কনের মত একটা ছন্দ তুলে তিস্তা এগিয়ে চলেছে। বিশাখা অতি উৎসাহী কিশোরীর মত খাদ বেয়ে নামতে থাকল। ও তিস্তার জল ছোঁবে। মণিবৌদি নিষেধ

করল। কিন্তু ও তখন অনেক নিচে নেমে গেছে। টিলার ওপর থেকে আমরা সকলে ওকে ফেরাতে চাইছি। একবার পা পিছলে গেলে বিপদ হতে পারে। বিশাখা একবার ওপরে আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে হাত নাড়লো। পরক্ষণেই ওর পা পিছলে গেল। টাল সামলাতে পারলনা। খরস্রোতা তিস্তা ওকে আলিঙ্গন দিল। আমরা আঁৎকে উঠেছি। একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য আমরা ড্রাইভারকে ডাকাডাকি করতে লাগলাম। বিশাখার স্বামী ততক্ষণে আমাদের ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে এসে বলল···বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। ও ভেসে যাবে এখুনি। আমাদের কিছু বোঝার আগেই টিলার ওপর থেকে ও লাফ দিল বিশাখার অচেতন দেহটার ওপর।

সাপ

মহাশ্বেতা দেবী

সাপটা রোজ আসে।

কালচে নীলের ওপর সাদা ডোরা কাটা, সেই সাপটাই। মদ্দা সাপ। ওফিলদ্দি চিনতে পারে ওর কাটা ল্যাজ দেখে। ওফিলদ্দিই একদিন কাটারি ছুঁড়ে মেরেছিল। ল্যাজের ডগাটা কেটে যায়। সাপটা মরে নি, বা ওকে কামড়ায় নি।

আয়েছার বিশ্বাস, ও ওফিলদ্দিকে কামড়াতে আসে। ওফিলদ্দির বিশ্বাস, ধানের মরাইয়ের পেছনে কোথাও ও গর্ত পেয়েছে ইঁদুরের। সেখানেই থাকে। ইঁদুর খেতে নিত্যি আসে না। সাপ রোজ খায় না, মাঝে মধ্যে খায়। সেই "মাঝে-মধ্যে"তে ফাঁক পড়বার জো নেই।

ওই মরাইয়ের এক পাশেই ওফিলদ্দি আর আয়েছা শোয়। তিন মাস আগে হলেও ওফিলদ্দি ধান টেনে উঠোনে ফেলত, গর্ত খুঁজে সাপ মারত। নিকিয়ে মুছে আবার ধান ওঠাত। তিন মণ ধান তুলতে কতই বা সময় যেত?

এখন আর তা সম্ভব নয়। হোসেনুল মল্লিক-এর ধানখেত ওফিলদ্দি ভাগে চষত। ভাগ নিয়ে গণ্ডগোল, ভীষণ গণ্ডগোল, ওফিলদ্দি জোর করে ধান এনে ঘরে তোলে। ক বছর ও মরাই ঘরেই থাকছে। বলত ঘরটা পড়ে গেল সে বর্ষায়। আর তোলা হয় নি।

মারদাংগা ওফিলদ্দি করে নি, তাই ননী আর শীতলের মত জেলে যায় নি। কিন্তু হোসেনুল পুলিস আনে। এখন, আজ পাঁচ দিন হল হোসেনুল ধান দেখে রেখে গেছে। ওফিলদ্দিকে বলে গেছে, 'সাত দিনের নুটিশ দিয়ে যাচ্ছি ওকে! ছেড়ে যাবি।'

হোসেনুল সে কথা বলতে পারে। ওফিলদ্দি যে জমিতে বাস করে, তাও হোসেনুলের। বারো বছরও হয় নি, স্বত্বও জন্মায় নি। স্বত্ব জন্মালে ওফিলদ্দিকে কেউ তুলতে পারত না। বাবুরাও তাই বলল। বাবুরা এখন ভাগচাষীকে মদত দিচ্ছে। তারাই যদি বলে, 'ওফিলদ্দি, তোমার বিপদটা খুব সত্যি, হোসেনুল মল্লিক পঞ্চায়েত-প্রধান, তাতেও আমরা ভয় খাই না, যদি আইনের জোর পাই। কিন্তু তুমি এ গ্রামে এসেছে মোটে সাত বছর। তোমার স্বত্ব জন্মায় নি। সে

ক্ষেত্রে তুমি ভাগচাষীর দলে পড়ছ না।'

'সেই তো বলতেছি বাবু। বারো বচরে স্বত্ব এসে আর বলেই ত পল্টুদি হতেও উটিয়ে দিচল। আমার বাপরেও তার আগে বাবু? আমি কোতা যাব?'

'খুব দুঃখের কথা ওফিলদ্দি। বারো বছরে স্বত্ব জন্মায়, আইন যা বলছে। আইন যেদিন পালটাবে, সেদিন তোমার মত চাষীদের উৎখাত করা সোজা হবে না।'

'আরে বাবু! আইন পালটে বেবস্থা হতে হতে আমি মাটির নিচোতে যাব।'

'আইন তোমায় মদত দিতে পারে না। মল্লিক যদি নিজে থেকে বিবেচনা দেখাত...'

'তা দেকায় কখুনো?'

'এরাই তো শ্রেণীশত্রু।'

'শত্তুর? কার?'

'তোমার—আমার—সরকারের।'

'আমার নয় শত্তুর হল, শত্তুরতা কর্তেচে যকন, তকন শত্তুর।

কিন্তুক '

'কি?'

'তোমাদের শত্তুরতা কোতা বাবু। দোষ নিউ নি. এত বলতেচ, উটতেচ ওর সাতে? সরকারের বা শত্তুর কোতা?'

থাইলে সরকার তারে পকাচ্ছেতের মাতা করে? শত্তুর কিসে বাবু?

'সে তুমি বুঝবে না ওফিলদ্দি।'

'আমি কোতা যাব. তাই বল? অ্যাঁ? তোমরা এত জান, সদাসব্বদা আসতেচ যেতেছ, কোতা কি হতেচে বিশ্বসোমসাবের খবর জান, আমার কি হবে তা জান না?'

ওফিলদ্দির কণ্ঠে হাহাকার থাকে। বাবুদের বুক ও বিবেক খুবই বিদ্ধ হয়। অন্ত সরকারের আমলে না হোক, এ সরকারের আমলে হোসেনুলের মুখে নুন পড়া ও ওফিলদ্দির সুব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল বলে তাদের মনে হয়। এবং এ কথা মনে হওয়া মানে সরকারে অনাস্থা অনুপরিমাণে প্রকাশ করা—তাও মনে হয়।

সকল সরকারে আস্থার ব্যাপারে সকল রাজনীতিক কর্মী যেহেতু ব্রেন-ওয়াশড্

সেহেতু বাবুরা মনকে শক্ত করে বাঁধে। ওফিলদ্দির ওপর ওদের রাগ হয়। এই ওফিলদ্দিদের নিয়ে যত ঝামেলা। এরা আবার সংখ্যা গরিষ্ঠ। ওফিলদ্দি, ওদের কতদিনের চেনা মানুষ! আচ্ছা, বর্গাদার বা ভাগচাষী বা আধিয়ার বা খেতমজুর, কিছু একটা তো হবি? কিছু একটা হ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ান তোকে মদত দেবে। কোনো ক্যাটেগরিতে না পড়লে রাজনীতিক পার্টি তাকে কি মদত দেবে? অথচ গ্রাম বাংলার অধিকাংশ লোকই ওফিলদ্দির মত ন্যাড়া। কোনো দলে পড়ে না। গ্রাম বাংলার অধিকাংশ মানুষই ক্যাটেগরির বাইরে। যারা কোনো-না-কোনো ক্যাটেগরিতে পড়ছে, তাদের বেলাও সুবিচার করা কঠিন, কেন না তাতে হোসেনুলদের প্রবল আপত্তি। হোসেনুলদের বাদ দেওয়াই দরকার। রাজনীতির গীতা পুস্তকেও তা লেখা আছে। কিন্তু ভারতভূমে তা হয় না। হোসেনুলরা কেন যেন সকল সরকারের মদত পায় এবং কোথাও কোথাও রং বদলে পঞ্চায়েত-প্রধানও হয়ে বসে।

এ সকলই তত্ত্ব। ওফিলদ্দি সামনে দাঁড়ানো বাস্তব। বাবুরা নিজেরা তাকে কিছু টাকা দেন ও বিদায় দেবার কালে বলে দেন, 'এতেই ভেঙে পড়লে চলবে না।'

'অ্যাঁ? ধান ক্রোক করল, বাস্তু ছাড়া কত্তেচে, তাতেও ভাঙব না? তবে কিসে ভাঙব তাই বলে দাও?'

'সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

'চালাতে ঝেরে তো মাগ্যে বাঁশ হল।'

'হোসেনুলরা চিরকাল থাকবে না।'

'সেও থাকবে, তোমরাও থাকবে, মত্তে মরব আমি, ননে, শেতল, কত পোকামাকড়।'

'হোসেনুলের সঙ্গে কথা বলে···'

'কতা কি বলব? কারে বলব? সে যা চায়, তা দেলে আমি বাঁচি?'

'কি চায়?'

'আরেছারে চায়। আরেছারে দিলি আমার ঘর ওটে, ধান পাই, সব থাকে। তোমরা কি বল? তাই দিতে বল?'

বাবুরা চুপ করে যায়। এ সব ব্যাপার রাজনীতিক আলোচনা দ্বারা ফয়সলা হবার নয়। ওফিলদ্দি চোখ মোছে ও বলে, 'কলকেতা ঘেরে ভিক্ষে কত্তে হবে। আর কিছু পত খোলা নি।'

ওফিলদ্দি বাবুদের নানা চিন্তায় বিব্রত করে রেখে আসে। মেয়েখেকো হোসেনুলকে পঞ্চায়েতের মাথা করাটা ঠিক হয়নি এ প্রশ্ন সকলেরই মনে আসে, এবং এ প্রশ্ন মনে আসা ঠিক নয় বলে সবাই বোঝে। ব্যাপারটি এই ভাবে অমীমাংসিতই থেকে যায়।

ওফিলদ্দি ঘরে ফেরে। আয়েছাকে বলে, 'বাবুদের কিছু করার নি। সাতটা ট্যাকা নিকিরা তুলে দেচে, ট্যাকা ফুরোতে না ফুরোতে টেনে চাপব।'

'কোতা যাবে ?'

'কলকেত্তা। ফুটপাতরে বসব। ভিক্কে করব।'

'মল্লিক যা বলে তা করতি পার না ?'

'কি বললি ?'

'নয় তাই কর। তোমারে ভাগের হক, বাস্তু, সব লিকে দিক।'

'তুই, তুই…'

'আমি যা করব তা জানা আচে।'

'কি করবি ?'

'গলায় কলসি বেঁদে জলে যাব।'

'মরবি ?'

'মরব। তুমি আবার সাদী বোসো।

'সে সাদীতে আমার সুখ ?'

'তবে আর কি, ভিক্কে কত্তে যাব।'

'মল্লিক… !'

'ঢ্যামনা নিত্যি আসে।'

'আমার সাড়া পেয়ে চলে যায়।'

'হ্যাঁ।'

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর আয়েছা বলে, 'যাও দেকি ? লক্কা নে এস দোকান থে ? লক্কা পুইড়ে ধোঁ দিলি যদি সাপ পালায়। ই কি অলুক্ষণ মা ? একনো যাই নি, ঘরে আচি, নিত্যি এসে সঁকোবি ? কোনো দিন বাগে পাই না ঝে মারব।'

'মারব নিশ্চয়। ঘুমোতে পারি না ভয়ে ?'

সাপটা তারপরেও ঢোকে, মরাইয়ে ঢোকে। ওফিলদ্দির মাথায় খুন চেপে যায়।

খুন চেপে যায় বলেই ও খড় কাটা বঁটিটার ফলা খুলে ফেলে। আছাড়ির ভারি কাঠটা নিয়ে অপেক্ষা করে। দরজার দিকে চোখ মেলে রাখে। সাপটা যেদিন ক্ষুধার্ত হবে, সেদিনই ভয়। রোজ খাদ্য চায় না সাপ, মাঝে-মধ্যে চায়। যেদিন চায় সেদিন না পেলে তবেই সে হিংস্র। নইলে শাঁখামুটি স্বভাবে ভোঁদা ও অলস। ঝপ করে কাটে না।

'ওফিলদ্দি ?'

'কে ?'

'ছিরিপদ।'

'আসতেছি।'

ওফিলদ্দি উঠে বেরিয়ে আসে। শ্রীপদর বলার কথাগুলি সুসংবাদ নয়। শ্রীপদ বলে, 'কিছু মানে নে ওফিলদ্দি। ঝত বড় ব্যাগাতা করু, বলে যা বলবার তারে বল্‌গা। ঝেয়ে জবাব শুণব।'

'কি বলে ?'

'যা বলতেচে।'

'যা বলতেচে, কি বলতেচে ছিরিপদ ? আয়েছারে দিলি আমারে সব দেবে ?'

'বলতেচে।'

'আয়েছারে নিকে করবে ?'

'না না, চারটে বিবি ঘরে।'

'নিকে করবে নে ? এমনি চায় ?'

'এমনি। বলতেচে তোর আয়েছা তোর থাকবে, তিনি আসবে—যাবে।'

'তুমি কি বললে ?'

'কি বলব ? তিনি আমারে ত কুকুর—গ্যাল বললে। তা বাদে বললে নিজি আসবে।

'হেতা ?'

'হেতা।'

ওফিলদ্দির মাথায় এখন বিস্ফোরণ ঘটে। আয়েছাকে নিকে করবে না, এমনি চায়। এমনি আয়েছাকে পেলে তবে সে ওফিলদ্দিকে হকের ধান সিজোতে দেবে। হকের ধানও তো নয়। বাবুরা তো তাও বলল। ওফিলদ্দি বোঝে, সে মুক্তি পাচ্ছে, বিশাল মুক্তি। সে ভাগচাষী নয়, কেন না বারো বছর মল্লিকের জমি চষে নি।

তাই তার বিষয়ে বাবুদের কোন দায় নেই, দায়িত্ব নেই সরকারের। সে পশ্চিমবঙ্গের এক স্বাধীনতম নাগরিক, কেন না আপনা-জেনানা ও কপনি ছাড়া তার কিছুই নেই। উপলব্ধিটি তাকে শান্ত করে। শান্ত ও সুদৃঢ় কণ্ঠে সে বলে, 'তুমি যাও।'

'কি করবি ?'

'দেকি।'

'এ বে কি লালচ মল্লিকের। যকন বাই চাগবে, তখন চাই-ই চাই।'

শ্রীপদ চলে যায়। ওর শেষের কথাগুলির প্রতিক্রিয়ায় ওফিলদ্দির এখন মনে হয়, মল্লিকই সাপ! খিদে পেলে খাদ্য চাই। অন্য সময়ে তার কাজ ওফিলদ্দিকে থানের সুখকর সান্নিধ্যেও এন্ত রাখা।

মল্লিক আসে। হাঁা, কোন ভুল নেই। নিঃশব্দে আসে মল্লিক, গায়ে ডোরাকাটা জামা, চোখ দুটি ক্রুর ও শীতল। ওফিলদ্দি ওকে দেখে মরাইয়ের ঝাঁপ খুলে দেয়। মল্লিক বোঝে, ওফিলদ্দির সুবুদ্ধি হয়েছে। সে মুখের বিড়িটা ফেলে দেয়, জুতো দিয়ে ঘষে নেভায়, হাসে, ঢোকে। ওফিলদ্দি খেড়ো বঁটির আছাড়িটা তোলে। বড় সাপ মারতে হলে আঘাত মোক্ষম হওয়া চাই। মল্লিকের মাথা মাটির পাত্রের মত ফাটে।

মেরে মেরে সাপটাকে থেঁতলে ফেলে ওফিলদ্দি। আয়েছা মুখে কাপড় গুঁজে দেখে।

তারপর আর মারার দরকার থাকে না। ওফিলদ্দি আছাড়িটা ফেলে দেয়। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। মেঝেতে আরেকজন।

ওফিলদ্দি বলে, 'য়্যামন আচিস্, তেমনি চল্। ভোর আতের টেন ধরব।'

আয়েছা গামছায় ওদের সমস্ত সম্বল বেঁধে নেয়, ভাতের হাঁড়ি। ওরা মল্লিককে টপকে বেরিয়ে পড়ে।

সেই সাপটা আজ ঢুকতে যায়, থেমে যায়, তারপর মুখ ঘুরিয়ে বেরিয়ে যায়। ওর সর্পিল চেতনা বলতে হয়তো কিছু নেই। তবু ও বেরিয়ে যায়। মৃতাবস্থাতেও মল্লিক জীবিত সাপটির চেয়ে অনেক ক্রুর ও ভয়াল, তাই বুঝেই কি ?

কর্কট রাশি, বৃষ লগ্ন

পূর্ণেন্দু পত্রী

আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কেন এমন হয়। কাউকে বলতেও পারি না। বললে বলবে, বানানো গল্প ছাড়ছি বাজারে। অথচ ঘটনা ঘটেই চলেছে, গুপ্ত হত্যার মত মর্মান্তিকতায়। প্রথম প্রথম মনে করেছিলাম, কো-ইনসিডেন্স। তৃতীয়বার থেকে সন্দেহটা সরু ছুঁচের মত গেঁথে যায় মনে। তারপর সরু ছুঁচটা ছুরি হয়, ছোরা হয়, পাঁঠা কাটার খড়্গ হয়। আমি ফালা ফালা হই, আমার ভিতরে রক্তপাত হয়। এই ভাবেই ক্যানসারের মত একটা উপশমহীন এবং যন্ত্রণাবহুল ব্যাধি আমার চেতনার ভিতরে থাবা পেতে বসেছে। একটানা দশ-বারো বছরের ব্যাধি।

প্রথমবারের ঘটনাটা বলি।

আমার এক মাসতুতো ভাই এসেছেন দিল্লী থেকে। ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং-এর হোমরা-চোমরা অফিসার। বাবা বাড়ি ফিরে বললেন,

—ওরে শিবু, পরশু তোর কি কাজ আছে?

—কখন?

—সন্ধ্যের পর। এই ধর সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ।

—তেমন কিছু নেই। টিউশানী ছিল। সেটা সকাল বেলায়।

—ওগো শুনছো···

যার উদ্দেশে বাবার ডাক তিনি অর্থাৎ মা এসে দাঁড়ালেন আমার ঘরের বিছানার কাছে। বাবা তখনো আপিসের জামা ছাড়েননি। বোতাম খুলছেন জামার। ভিতরে বোধহয় কোনও চাপা আবেগ বা আনন্দ হাঁড়ির ভিতরের ভাতের মত ফুটছিল। সেদিন বাবার চোখ-মুখ যেন নেয়াপাতি ভাব।

—জানো, শিবুটার বোধহয় একটা হিল্লে হয়ে যাবে। তবে কলকাতায় নয়, দিল্লীতে। সমীরণ এসেছিল যাইটার্স-এ। কী দরকারে চীফ মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলবে। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এখনো অনেষ্ট আছে ছেলেটা। নমস্কার না করে মেসোমশাই বলে প্রণাম করলে। অনেকক্ষণ কথা বললে। তখনই শিবুর কথাটা বললুম। তোমরা আছ, দেখনা, যদি উন্নতির একটা রাস্তা করে দিতে পার। এম. এ পাশ করে বসে আছে। সব

শুনল, বলেছে পরশু দিন সন্ধ্যের পর ওদের বাড়িতে যেতে। তুমিও একবার চলে যাও না। অনেক দিন তো বোনকে দেখনি।

আমি আর মা দুজনে মিলেই গিয়েছিলাম সেজ মাসীমার বাড়ি। মায়ের বেশ গল্পগুজবে কাটছিল। আমার মনটা মিয়ানো মুড়ি। কেননা সমীরণদা হঠাৎ সেইদিনই সকালের ফ্লাইটে চলে গেছেন দিল্লী, আর্জেন্ট ট্রাঙ্ককল পেয়ে। তবে পরের দিনই ফিরে আসবেন। তাই বলে গেছেন, আমি যেন কাল সন্ধ্যেয় আসি।

রাত হয়েছে। আমরা উঠবো উঠবো করছি। যেতেও হবে অনেক দূর। আলিপুর থেকে শ্যামবাজার। সেই সময়েই দিল্লী থেকে এল আরেক ট্রাঙ্ককল। খবর পেয়ে মাসীমা মূর্ছা গেলেন। সারা বাড়িটা মড়া আগলানো শ্মশানের মত হয়ে গেল শোকে, দীর্ঘশ্বাসে, কান্নায়, চীৎকারে, নীরবতায়। সমীরণদা সেদিন সকালেই মারা গেছেন এয়ারক্রাসে। এরপর দ্বিতীয়বারের ঘটনা।

পুষ্পেন আমার সহপাঠী। বি-এ পর্যন্ত আমরা এক কলেজের ছাত্র। তারপর চলে গেল খড়্গপুরের আই. আই. টিতে। আমি তখন এক মফঃস্বলের কলেজে। বদলির চাকরী। পুষ্পেন ততদিনে তুখোড় ইঞ্জিনীয়ার। আপাদমস্তক বদলে গেছে সে। আগে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবীর। এখন স-টাই স্যুট। মুখের পাইপ সব সময় হাতে। ছিল এ্যালুমিনিয়ম। হয়ে গেছে ইস্পাত। চাকরী পেয়েছে জার্মানীতে। চলে যাবে। যাবার আগে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে মিট-টোগেদার। বাড়ীতে নয়। পার্ক স্ট্রীটে। খরচে নাকি ডুবিয়ে দেবে। আমি যাব না বলেছিলুম। কারণ খরচে মান করে বাড়িতে ফিরলে মা যাবেন গঙ্গাস্নান করতে, বাবা দরজা খুলে দেবেন চিরকালের গেট আউটের জন্যে। আমাদের পরিবার গোঁড়াস্য গোঁড়া। কনজারভেটিবস্য কনজারভেটিব। লুকিয়ে চুরিয়ে খাইনা তা নয়। তবে তাকে ভোজন না বলে আচমন বলাই ভাল। পুষ্পেন নাছোড়-বান্দা। সে বললো, ঠিক আছে, রাত্রে বাড়িতে ফিরতে হবে না। আমাদের বাড়িতে থাকবি। আমি ফোনে মেসোমশাইকে বলে দেবো। বলে দিয়েও ছিল। পুষ্পেনের এতটা পেড়াপিড়ি করার অন্য একটা কারণ ছিল। ও যাকে বিয়ে করবে, তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। এখন কোর্টসিপ। বিয়ে করবে সামনের বছর। ওদের প্রেম নাকি অনেকদিনের। মেয়েটি পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী। পুষ্পেন বলেছিল।

—ব্রিলিয়ান্ট, এ্যাট দা সেম টাইম বিউটীফুল। এ রেয়ার কমবিনেশন অব

আর্টিসটিক্ টেমপারামেন্ট এ্যাণ্ড ইউবিক্যুইটাস ইনটেলেক্ট। দুর্দান্ত ক্লাসিকাল গায়। ছবি আঁকে। ক্যামেরায় পাকা হাত। একবার বিউটি কনটেস্টে দাঁড়িয়েছিল। একবারই। মিস ইণ্ডিয়া। তুমি শালা কবিতা লেখো। আমরা জানি না। ও জানে। তোর এ্যাডমায়ারার।

অনেক কাল বাদে, বলতে গেলে সেই বছর পাঁচেক আগের কলেজ লাইফ বাদ দিলে, জীবনে একটা হৈ-চৈ-এর সুযোগ। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। তৎসহ অসাধারণ রূপসী এবং বিদুষী রমণীর মুখ থেকে প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি। তদুপরি স্বচ, যা লাষ্ট ফাইভ ইয়ারে চাখিনি। আমার পিঠে দুটো ডুরডুরে ডানা গজাচ্ছিল। মনে মনে দিন গুনে চলেছি কবে আসবে উনিশে অগাষ্ট।

আপনি কী অনুমান করতে পারেন, এর পরের ঘটনা? আপনার পক্ষে পারা সম্ভব নয়। কারণ আপনি মানুষ। হয়তো ঈশ্বর পারেন কিংবা দেবদূত। কেননা তাঁরা স্বর্গ নামক এক মুটোপিয়ান ওয়ার্ল্ডের অলীক প্রাণী। হয়তো স্বর্গের কোন জায়েণ্ট-সাইজের মাকড়শাদের নামই ঈশ্বর-টিশ্বর। ঐ উনিশে অগাষ্ট সকালেই সুইসাইড করেছিল পুষ্পেন। সেই ব্রিলিয়াণ্ট এ্যাট দি সেম টাইম বিউটিফুল মেয়েটিই, যার নাম পরে জেনেছি আমরা, মল্লিকা, তার মৃত্যুর কারণ। সেদিন সারারাত আমাদের কারও পেটে এক ফোঁটা জলও পড়েনি। খবর পেয়েছিলাম বিকেলে। তারপর থেকে থানা, পুলিশ, হাসপাতাল। পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া গেল পরের দিন। তারপর শ্মশান। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম জ্যান্ত মুরগী। ফিরলাম রোষ্টেড।

প্রথম দুটো ঘটনাই বললাম। আরও আছে। বলতে ইচ্ছে করে না আর। শ্বাসকষ্টের মত ব্যথা লাগে বুকে। এই সব স্মৃতিই আমাকে একলা করে দিয়েছে। আমার আমি ছাড়া আর কোনো আত্মীয় নেই। যখনই দেখবো কোনো মানুষের উপর নির্ভর করছে আমার সুখ অথবা সাফল্য, সে মানুষ থাকবে না। গভীর কোনো প্রত্যাশা নিয়ে যারই সংস্পর্শে আসি, সে ধ্বংস হয়ে যায়, থাকে না। কেন এমন হয় বলতে পারেন? আমি কর্কট রাশি, বৃষ লগ্নের জাতক বলে? জন্মেছিলাম রাত্রে। ফাল্গুনে। ফাল্গুন সম্বন্ধে কবিরা কত মিছরি-মিছরি কথা লিখে থাকেন। কবিতা লেখার সময় আমিও লিখি। এখন নয়। আগে লিখতাম। অথচ আমার জন্মদিনের ফাল্গুনটা ছিল পৃথিবীর একটা জঘন্যতম দিন। সকাল থেকে বৃষ্টি। কোড়ো হাওয়া। কাদা ল্যাপটানো ঘর-দোর। আমি জন্মেছিলাম আমার দেশের বাড়িতে। মেদনীপুরে। আমি জন্মানোর

মুহূর্তে শাঁখ বাজানো হয়েছিল। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরা কেউ শুনতে পায়নি। বিপুল বিপর্যয়ের মধ্যে এত নিঃশব্দে আমার জন্মলাভ।

এত কথা আপনাদের বলছি একটা ভয়ংকর কারণে। আমার ভিতরে একটা ভীষণ শব্দময় এবং অস্থির কাপুনির জেনারেটার চলেছে যেন। কিংবা অসংখ্য বিকটাকার যন্ত্রপাতি নেমে পড়েছে গর্ত খুঁড়তে। আমার সামনে জীবন এবং মৃত্যু, সৌভাগ্য এবং সর্বনাশ, রেঁস্তোরায় প্লেটের দুপাশে কাঁটা আর চামচ যেভাবে সাজানো থাকে, সেইভাবে পাশাপাশি। আকস্মিকভাবে আমি এক দুর্ঘটনার মুখোমুখি।

আমি এখন চাকরী করছি কলকাতাতেই। বাংলার অধ্যাপক। পার্মানেন্ট। বাবা মারা গেছেন। মায়ের একটা টিউমার তুবার অপারেশন করার ফলে তিনি শয্যাশায়ী। আমার ছোট ভায়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই এক ছেলে। ছোট পরিবার। সুখী পরিবার। দুই বোন। তারাও বিবাহিতা। এবং সুখী। আমি বিয়ে করিনি। কেন করছিনা, তা বাড়ির লোককে বোঝাতে পারি না। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এইভাবেই চলেছিল আমার সন্ন্যাস-জীবন। কবিতা আর লিখিনা। যেহেতু কবিতার কাছেও আমি মনে মনে একসময় হাত পেতেছিলুম. আমাকে খ্যাতিমান জ্যোতিষ্মান করো এই প্রার্থনায়, কবিতা মুছে গেছে মর্মমূল থেকে। সত্যিকথা বলতে গেলে বড় নির্ভয় এবং নিরাপদ জীবন কাটিয়ে চলেছিলাম ক-বছর। পূর্ণতাহীন, প্রত্যাশাহীন, অথচ পরিতৃপ্ত। তাই ইতিমধ্যে মারাও যায় নি কেউ। একমাত্র অনিমেষ ছাড়া। অবশ্য অনিমেষের মৃত্যুর সঙ্গে আমার ককট রাশি এবং বুধ লগ্নের কোন সম্পর্ক নেই। অনিমেষ মারা যাবে, এটা আমি জানতুমই। দুম্ করে ষ্টেটসম্যানের সোনার চাকরী ছেড়ে দিয়ে ও যেদিন গেরিলা হয়ে গেল ডেবরা-গোপীবল্লভপুরের অন্ধকার জঙ্গলে? সেইদিনই। অনিমেষের কাছে আমার কোনও প্রত্যাশা ছিল না। অনিমেষকে আমি ভুলেও গিয়েছিলাম। মনে পড়েছিল শুধু একবার। কয়েকদিনের জন্যে। আমাদের বাড়ির সামনে, অর্থাৎ দেশবন্ধু পার্কের কাছাকাছি অঞ্চলে তখন এক ত্রাসের রাজত্ব। বোমাবাজীর শব্দে কান, প্রায় ঘর বাড়ি চৌচির। এবেলা খুন। ওবেলা খুন। ষোলো সতেরো বছরের ছেলেরা সব খুন হচ্ছে। ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেদের মুখ-চোখ-চুল-হাসি-হাঁটা-চলা রাজহংসের মত। যতখানি মাধুর্যময় হওয়া উচিত ছিল, তারা তখন তেমন ছিলনা। তাদের চোখ একই সঙ্গে বিপন্ন এবং অগ্নিময়।

তাদের চুলে যেন ছাই-মাখা সন্ন্যাসীর জট। তাদের হাসি ছুরির ফলার মত। তাদের হাঁটা হায়নার মত নিঃশব্দ অথচ বড়যন্ত্রময়।

একদিন একটা মার্ডার হল একেবারে আমাদের বাড়ির দরজায়। আমরা সেই সতেরো বছরের ছেলেটির মৃত্যু-চীৎকার শুনেছিলুম। কিন্তু কেউই দরজা খুলে তাকে বাঁচাতে আসিনি। সারাদিন সারারাত আমরা ছিলাম দরজা-জানালা ভেজিয়ে। যেন দুর্গ। যেন সভ্যতার থেকে অনেক দূরের দুর্গম পাহাড়ে রয়েছি। পৃথিবীর সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির নাগালের বাইরে। সেইদিন রাত্রে আমার মনে পড়েছিল অনিমেষকে। মনে মনে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলুম অনিমেষের সঙ্গে। অনিমেষের হাত দুটোকে জাপটে ধরে বলেছিলুম

—এ কী করছিস তোরা? সমস্ত ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেরা, সমস্ত পোটেনশিয়াল ইয়ুথ যদি এইভাবে এক পক্ষ অন্য পক্ষের ছোরায় পাইপগানে শেষ হয়ে যায়, তোদের ভবিষ্যৎ সেনাবাহিনী গড়বি কাদের নিয়ে? এ কী হত্যা এবং হিংসার চারা বুনলি তোরা? অনিমেষ, তোরা চাইছিস মানুষের মুক্তি। আর মানুষ তোদের ভয় পাচ্ছে। এতগুলো দিন-মাস-বছর ধরে যারা মারা গেল তারা কার শত্রু? তারা কে? তারা তো মন্ত্রী নয়। হোর্ডার নয়। কালোবাজারী নয়। ক্যাপিটালিষ্ট নয়। তারা তো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া বানায় নি? ইকনমিক কমিশনের সদস্যও ছিলনা? তারা কেউ সংবাদপত্রের মালিক ছিল না। সংস্কৃতিতে কুরুচির ভেজাল দেয়নি কেউ। সভ্যতাকে শুয়োরের আখড়া বানায় নি তারা। তারা মানুষ। নিছক মানুষ। ধুলোর ফুল। ফুটপাতের পলাশ। তারা কেন নিহত হবে অনিমেষ? ষোলো-সতেরো বছর বড় স্বপ্নময়। স্বপ্নকে হত্যা করতে নেই।

অনিমেষ সেদিন আমার মনে মনে বলা সব কথা মন দিয়ে শুনেছিল। শুনে বলেছিল

—ঘাবড়াসনা শিবু! আমরা আসছি। রাজনীতি একটা অংক। যোগ-বিয়োগের ভুল হয়ে যায় কখনো কখনো। আমরা ভুল বুঝতে পেরেছি। আবার আসছি। যারা নিহত হয়েছে, তাদের হাড়-কঙ্কাল, থ্যাৎলানো হৃদয়, চৌচির মাথার খুলিগুলো হাতড়ে হাতড়ে আমরা খুঁজে নেবো সমস্ত হারানো স্বপ্ন। ভয় পাসনা শিবু। এই রক্তাক্ত অন্ধকারকে আমরাই বদলে দেবো রোদের কল্লোলে।

সেইদিন থেকে বেশ কয়েকটা দিন অনিমেষ আমার খুব কাছে রয়ে গেল। মন থেকে মুছে গেল ভয়, উদ্বেগ, আশংকা, এবং সুস্থতাবোধ। কিছুদিন যে-

কোন দুর্ঘটনা অথবা হত্যাকাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে মন্ত্র পাঠের মত বলে যেতাম

—ভয় নেই। অনিমেষরা আসছে অন্যরকম হয়ে। কলকাতা নামের হিংস্র অরণ্য আবার উদ্যান হয়ে যাবে।

কী জানি, ঐটুকু প্রত্যাশাই হয়তো ভুল হয়েছিল। হয়তো জেল থেকে পালাবার সময় অনিমেষের গুলী খেয়ে পিঠ বাঁকিয়ে মরার কারণ, অনিমেষকে ঘিরে আমার ঐ স্বপ্ন-সাধ। হতে পারে। আগে মনে হয়নি। এখন মনে হচ্ছে, হতে পারে।

যাই হোক, বেশ কয়েকটা বছর শীতের রাতের ঠাণ্ডা ভাতের মত বেশ ছিলাম আমি। কারো কাছে আমার কোন প্রত্যাশা ছিল না। তাই মৃত্যুও ঘটেনি কারো।

হঠাৎ ঘটে গেল দুর্ঘটনা। যার কথা বলছিলাম।

আমার কলিগ সুনীত, ইতিহাসের অধ্যাপক। একদিন জোর করে নিয়ে গেল পার্ক হোটেলের এক শাড়ীর একজিবিশনে। সুনীতের সঙ্গে তার স্ত্রী মহুয়া। সুনীত আর মহুয়া শাড়ি ঘাঁটছিল। আমি কেবল শাড়ির শোভা দেখছিলাম। সেই সময় দ্বিতীয় এক মহিলার সঙ্গে মহুয়াকে দেখলাম গল্প করতে। তারই কিছুক্ষণ পরে মহুয়া সেই মহিলাকে আমার সামনে টেনে নিয়ে এল। তিনি সামনে এসেই কিছু না বলে আমাকে নমস্কার করলেন। মহুয়া মিষ্টি হেসে পরিচয় করিয়ে দিলে

—মল্লিকা দাশগুপ্ত।

মনের ক্ষোভ বা বিরক্তি মনেই লুকিয়ে আমি ভদ্রতাসূচক ভঙ্গীতে বললাম—

—আপনার নাম শুনেছি···

মল্লিকা তার আগেই বলে উঠল

—আপনার নাম পুষ্পেনের কাছে অনেকবার শুনেছি। আলাপ হয়নি। কিন্তু একদা আমি আপনার কবিতার একজন ভক্ত পাঠিকা ছিলাম। আজকাল কী একদমই লেখেন না? দেখিনাতো।

—না।

—সামনের সপ্তাহে বিড়লা এ্যাকাডেমীতে আমার পেইনটের-একজিবিশন। আসবেন? আমার কাছে, আয়াম স্যরি, এখন একটাও কার্ড নেই। আমি মহুয়ার মারফৎ পাঠিয়ে দেবো। আসবেন কিন্তু।

স্বতস্ফূর্তভাবে হ্যাঁ বলতে পারিনি। কারণ আমার মন বলছিল, ঐ মেয়েটি হল পুষ্পেনের হত্যাকারী। ওর সঙ্গে মিশোনা শিবনাথ।

তবুও ঐ সুনীত মহুয়ার টানেই একজিবিশনে গিয়েছিলাম। একেবারে লাষ্ট ডেটে। সেদিন মল্লিকা আমাকে নিমন্ত্রণ করল ওর বাড়িতে। ঠিকানা লেখা কার্ডটা তুলে দিলে হাতে।

গতকাল গিয়েছিলাম। ওর আঁকা ছবি দেখলাম আরো অনেক। একটা প্রকাণ্ড কোলাজ দেখলাম নিজের বিছানার কাছে। ওর অভিনব ধরনের বুকশ্যাক দেখলাম। সত্যিই ও কবিতা ভালবাসে। অজস্র কবিতার বই থাক্‌কে থাক্। ওর রেকর্ডের স্তূপ দেখলাম। ঘরের কোনে কার্পেটের উপরে দাঁড় করানো তানপুরা দেখলাম। ওর হাসি দেখলাম। গর্বিত গ্রীবার মরালের মত হাঁটা দেখলাম। ওর সরু কোমরের ঢেউ এবং বুকের তরঙ্গ দেখলাম। ওর সরলতা দেখলাম। বুকের ভিতরের লুকনো শূন্যতা এবং কান্না এবং অভিমানের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। পুষ্পেনের আত্মহত্যার কারণও জানা হয়ে গেল। মল্লিকার কাছে হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়েছিল ওর ভিবচারি। সেই মৃত্যুর এত বছর পরেও মল্লিকা কেন বিয়ে করেনি তাও জানা হয়ে গেল। বুঝলাম, পুষ্পেনকে ও যথার্থই ভালবাসতো।

একদিনের আলাপেই মল্লিকা তার বন্ধ হৃদয়ের অনেকগুলো বোতাম খুলে ফেললে আমার কাছে। উঠতে যাব। আমার সামনে এগিয়ে ধরল একটা মরলা বই আর সবুজ ভটপেন। তাকিয়ে অবাক। আমারই কবিতার বই। আমার প্রথম ও শেষ কবিতার বই। মল্লিকার চোখে তখন শরৎকালের ভিজে শিউলীতলার মত এক স্নিগ্ধ অনুনয়···

—কবিকে পেয়েছি সামনে। ছাড়বো না। কিছু লিখে দিন।

দ্বিধান্বিত। কী লিখবো বুঝতে পারছি না। হঠাৎ উড়ো পালকের মত মনে এসে গেল জীবনানন্দের একটা কবিতার ভুলে যাওয়া কয়েকটা লাইন। আমি লিখে দিলাম—

"যে আমাকে চিরদিন ভালবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনদিনই দেখিনি
সেই নারীকে···"

—বাঃ, চমৎকার! জীবনানন্দের লাইন। জীবনানন্দ বুঝি আপনার সবচেয়ে প্রিয় কবি?

—হ্যাঁ।

—আমারও? বিদেশীদের মধ্যে?

—বোদলেয়ার। আপনার?

—রিলকে আর এলুয়ার। ঈস্, জানেন জীবনানন্দের দুটো বই আমার নেই। মহাপৃথিবী আর ঝরাপালক। পাওয়া যায় না আর?

—না বোধহয়। আপনি পড়বেন? আমার আছে।

—দেবেন?

—কেন দেব না?

—কবে আসছেন আবার?

—দেখি। গান শোনাবেন সেদিন?

—শোনাবো।

কোনও একদিন যাব কথা দিয়েছিলাম। আজ নয়। অথচ আজ এই সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় আমি এইমাত্র বাস থেকে নামলাম। ল্যান্সডাউনে। মল্লিকাদের বাড়ির কাছে। আমার হাতে, মহাপৃথিবী। ঝরাপালকটা খুঁজে পেলুম না।

আজকেই কেন ছুটে এলাম? কাল কিংবা পরশু এলেও তো চলতো। হ্যাঁ চলতো? কোনদিন না এলেও কোন ক্ষতি ছিলনা। কেননা আমার জীবনকে আমি বানিয়ে নিয়েছিলাম পাড়হীন বিধবার শাড়ি। তবু ছুটে আসতে হল। কাল সারারাত, আজ সারা দিন আমার ভিতরে একটা তুমুল সাইক্লোন। ডুবে-যাওয়া জাহাজের মত আমি বিপন্ন, বিধ্বস্ত, আর্তনাদময়। কাল সারারাত, আজ সারাদিন মল্লিকার কাছে যাব কী যাব না এই প্রশ্নের ঝড়ো হাওয়ায় ওলোট-পালোট হয়েছি আমি। কাল সারারাত, আজ সারাদিন আমার শরীর জ্বরের জলুনি-পুড়ুনির মত কেঁপে কেঁপে উঠেছে এক অপ্রতিরোধ্য যৌন-কামনায়। যেন দীর্ঘকালের পাথর-হয়ে-থাকার ঘুম থেকে সহসা জেগে উঠেছে মহেনজোদারোর বৃষ, তার প্রবল জীবনীশক্তি নিয়ে। কাল সারারাত, আজ সারাদিন আমার ভিতরে কেবলই কথা বলে-বলে, হেসে-হেসে, হেঁটে-হেঁটে, দুষ্প্রাপ্য সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে রাজহংসীর মত সাঁতার কেটেছে মল্লিকা। অনন্তকাল পরে জীবনের অর্থ ও স্বাদ খুঁজে পেয়েছি আমি। অনন্তকাল পরে কবিতার আবছায়াময় সব পংক্তি ভ্রমরের গুনগুনোনি শুরু করে দিয়েছে আমার চোখে, চিবুকে, চুলে, সর্বাঙ্গে। কাল সারারাত আজ সারাদিন কেবলই মল্লিকাকে

বলেছি, কী প্রগাঢ় ঘুম, কী বিপুল অপচয়ের ভারী পর্দাটাকে তুমি সরিয়ে দিলে মল্লিকা, হঠাৎ আমি যেন এসে পড়েছি শতকোটী নক্ষত্রের নহবত-বাজানো সমারোহের ভিতরে। মল্লিকার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার পা কাঁপছিল। কলিং বেলের সামনে হাতটা নিয়ে গিয়েও ফিরিয়ে এনেছিলাম একবার। কারণ আমি যে কর্কট রাশি এবং বৃষলগ্নের জাতক।

এইমাত্র কলিং বেলটা টিপলাম আমি।

এবার কে নিশ্চিহ্ন হবে? আমি? না মল্লিকা?

শুধু কবি ও কবিতার জন্যে

বেরুচ্ছে

কবিতা গ্রন্থাগার

কবিদের কাছে কবিতা

পাঠাতে অনুরোধ রইল

সম্পাদক : স্বদেশরঞ্জন দত্ত

১৮ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ২০

মা, অথবা আমার সুমিতা

অমিয় রায়চৌধুরী

রেল লাইন ধরে হাঁটছে একটি ছোট্ট ছেলে। খালি পা। ছেঁড়া জামা। রুগ্ন। একটু যেন খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে। আমি চমকে উঠলাম। ভয় পেলাম। ঝিকিমিকি আলোর রোশনি। ট্রেন আসছে। আমি আঁতকে উঠলাম। আমি চীৎকার করে ডাকলাম। এই নেমে এসো। নেমে এসো। গাড়ি আসছে। ওর গতি আরো দ্রুত হলো। এখন ও দৌড়চ্ছে। আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে ওকে ধরতে চাইলাম। চীৎকার করে বললাম, থামো, নেমে এসো। ও শুনতে পেল না কিংবা শুনতে পেয়েই ও দৌড়তে সুরু করেছে। আলোটা আরো বড়ো হয়ে গেল। একটু আগের নিরীহ আলোটা এখন তেজী। ছেলেটি টানেলের কাছাকাছি পৌছে গেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার টানেল। নেমে আসার জায়গা নেই ওখানে। দেয়াল আর লাইনের মধ্যে ব্যবধান সামান্যই। আমি ওকে প্রায় ধরে ফেলেছি। দু'জনের ব্যবধান কমে এসেছে। আমি এখন অনেক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওর ভাঙাচোরা শরীরটা ধুকছে, গতি প্রখর। একটা আহত জন্তু যেন হ্যাঁচড়ে হ্যাঁচড়ে স্লিপার থেকে স্লিপারে পৌছচ্ছে।

জোরালো আলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কানে তালা লাগিয়ে দিলো যান্ত্রিক শব্দ। মৃত্যুর দুটি কালো হাত টানেলের মধ্যে ঝুলছে। যেন একই সংগে দু'জনের গলায় ফাঁস পরিয়ে দেবে। ···হাজারটা বাজ একসংগে ঝলসে উঠল। সেই ভয়াবহ আলোর ধাক্কায় আমি অন্ধ হয়ে গেলাম। আর কিছু জানি না। লক্ষ কোটি অদ্ভুত নিদ্রুত গমগম শব্দ। কানের মধ্যে দিয়ে বুকের মধ্য দাপাদাপি।

২

জ্বরে আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। একটু জল। কে দেবে জল? কাটামুণ্ড সেই মোষের জিভের মতো আমার জিভ বেরিয়ে এসেছে। আমি মাকে ডাকলাম। মা মা একবার এসো। শুধু একটি বার। মা এলেন না। আসবেন কি করে? তিনি তো সেই কবেই চলে গেছেন। অভিমানে আমার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে

এল। মায়েরা কেন সন্তানদের ভাইনিদের কাছে ফেলে রেখে চলে যান? আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে স্বর্গে না কোথায় চলে যান। কেন যান? তাঁরা কি জানেন না এখানে ভাত নেই, ভালোবাসা নেই।

আমি মার কাছে ছুটে যেতে চাই। তিরিশ বছর পিছিয়ে যাই। দশ বছরের শিশু হয়ে যাই। আবার সেই রেল লাইন। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার টানেল। হাজার মেগাওয়াট আলো। অন্ধ হয়ে যাই। কানের মধ্যে লক্ষ কোটি শব্দের হাতুড়ি পেটা। মুক্তি। মুক্তি। একটি মুহূর্তের ভগ্নাংশ। তারপরেই চিরতরে বেঁচে যাওয়া। এ পৃথিবীতে বাঁচা বড়ো কঠিন। কে একজন আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এল। একটা ট্রেন গম্ গম্ শব্দ করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

৩

উঃ কী ভীষণ কষ্ট! কী ভীষন-যন্ত্রণা! শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে। আগুনে মার শরীরটা যেমন পুড়েছিল। মাথায় যন্ত্রণা। মাথাটা কি রেল লাইন? সেই লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে। আমি মাকে ডাকলাম। আমার সেই সুন্দর মাকে। মাথা থেকে ঢল নেমেছে চুলের। ছোট্ট কপালে নতুন সূর্যের মতো টিপ। সাদা খোল লাল পাড় শাড়ি। স্বভাবে অভাব বোধ ছিল না। কোনোদিন 'নেই' 'নেই' শুনিনি। আলতাপরা ফর্সা নরম পায়ে হাত ছোঁয়াতে গেলে টেনে তুলে নিতেন বুকের মধ্যে। বলতেন; তুই মানুষ হবি। মানুষ হওয়া কাকে বলে কেউ আর বোঝালো না। কেউ শেখালো না।

অন্ধকার সব সরু সরু গলি। স্যাঁতসেঁতে। দুর্গন্ধে ভরা। সেই সব গলিপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একদিন টের পেলাম আমি 'ম্যান' হয়ে গেছি। কিন্তু মানুষ হতে পারিনি। মার ভবিষ্যদ্বাণী ফলেনি। আমি ম্যান্ হয়েছি, অ্যান্টম্যান হয়েছি। মানুষ হতে পারিনি। আবার সেই রেল লাইন। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্। শরীরে আগুনের তাপ। বুকের মধ্যে তৃষ্ণা। মায়ের তৃষ্ণা। মাথার মধ্যে নেশা। মায়ের নেশা।

৪

ঝড় কিনা জানি না। বাইরে থেকে ধাক্কা খেয়ে দরজা খুলে গেল। বাইরে এখন বৃষ্টি। অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি। কে একজন আমার মাথার পাশে এসে বসল। তার পরনে শাড়ি। সে আমার কপালে হাত রাখল। উঃ কী গরম হাত। সে বললো, কষ্ট হচ্ছে? কি কষ্ট বলো আমায়।

কি করে বলবো? মাকে ডাকতে ডাকতে আমার কণ্ঠনালি ছিঁড়ে গেছে।

—আমি সুমিতা। বলো আমার কি কষ্ট হচ্ছে তোমার ?

নামটা চেনা চেনা। হ্যাঁ একটু একটু মনে পড়ছে কবে যেন একজন মিতাকে আমি চেয়েছিলাম। মিতার বদলে মিতার চেয়েও বেশী সুমিতাকে পেয়েছিলাম। সে কিছুদিন আমার মাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। সুমিতার নাম শুনে আমি রেগে গেলাম। আমি তো সুমিতাকে চাইনি। সে তো কবেই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

—তুমি কোন্ সুমিতা ? যে বলেছিল আমি একটা অকেজো গাড়ি। বড়্কথা অকেজো গাড়ি। বাইরেটা ঝকঝকে ভিতরে বিকল যন্ত্রপাতি। যে গাড়ি নিয়ে রাজপথে বেড়ানো যায় না। যাওয়া যায়না সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ি।

—না আমি সেই সুমিতা নই। সেই সুমিতা অনেক নতুন, অনেক দামী গাড়ি চড়েছে এতদিন। কিন্তু শান্তি পায়নি। গাড়ি কি কোনোদিন মানুষের পরিপূরক হতে পারে ? তাই সে মানুষের কাছেই ফিরে এসেছে।

—এসব কথা আমার বিশ্বাস হয় না। আমি কাউকে চাইনা। আমি চাই শুধু আমার মাকে। যদি তুমি সুমিতা হও, যার সংগে এক সময়ে খুব ভাব ছিল আমার তবে আমার একটা উপকার করো। আমাকে তুলে ধরো। দাঁড় করিয়ে দাও। একবার দাঁড়াতে পারলেই আমি হাঁটতে পারবো! হাঁটতে হাঁটতে রেল লাইনে গিয়ে উঠবো। হাঁটতে হাঁটতে টানেল পেরিয়ে নেমে যাবো বাঁশবনের ঢালু জমিতে। তারপর খালের ধারে সেই জায়গায় পৌঁছবো যেখানে সব সময় আগুন জ্বলছে। আমার খুব চেনা রাস্তা। অনেকবার গিয়েছি সেখানে। সেই জায়গাটাও আমি চিনতে পারবো যেখান থেকে আগুনের লকলকে শিখা ধরে মা আকাশে উঠে গিয়েছিলেন। মিলিয়ে গিয়েছিলেন ধবধবে সাদা মেঘের মধ্যে।

তুলে ধরো আমাকে। সুমিতা যদি কোনোদিন আমাকে ভালোবেসে থাকো তবে সেই সুবাদে আমাকে তুলে ধরো। দাঁড় করিয়ে দাও আমাকে।

সুমিতা কিছু বললোনা। অন্ত কে একজন আমার কপালে হাত রাখলো। আমি চমকে উঠলাম। কী ঠাণ্ডা সেই আঙুলের স্পর্শ! আমি তার আঙুল স্পর্শ করলাম। ঠিক মার মতো সরু সরু আঙুল। আমি সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টি ফিরে পেলাম। সেই আলোয় অন্ধকারেও স্বচ্ছ, স্পষ্ট সব কিছু দেখতে পেলাম। মার মতোই দেখতে অনেকটা। মার মতো মুখের গড়ন। হাসির ধরন। সে বলছিল, চুপ করো। শান্ত হও। ঠিক মার মতো গলার স্বর। চুড়ির রিন

ঝিন টিন টিন শব্দ। আমি শক্ত করে তার কব্জি আঁকড়ে ধরলাম। কী সুডৌল, নিটোল, কী নরম তার কব্জি। ঠিক মার মতো। তার শরীর থেকেও মা মা গন্ধ পাচ্ছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কে তুমি?

সে বললে,—আমি তোর মা।

আমার মাথাটা ঘুরে গেল। মা? মা কি করে আসবেন?

তিনি তো কবেই আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন।

পট্ পট্ শব্দ শুনতে পেলাম। সেই রহস্যময়ী নারী ব্লাউজের বোতাম খুলছে বোধহয়। খস্ খস্ শব্দ। কাঁধ থেকে নাভি পর্যন্ত জ্যোৎস্নার আলো। আমি সম্মোহিত। নিথর নিস্পন্দ। কী যেন ঘটতে যাচ্ছে। এরই নাম কি মৃত্যু? মুক্তি? কিংবা বাঁচা?

সমুদ্রের সব ঢেউ নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। আমার শরীর থেকে বস্ত্রখণ্ডের সব কিছু সে খুলে নিয়েছে। চাঁদ তার সব জ্যোৎস্নায় আমাকে ঢেকে দিল। সে তার বুকের মধ্যে আমার মুখ চেপে ধরলো। সে বললে,

—খা খা। তোর বড়ো মায়ের তৃষ্ণা।

অনাস্বাদিত অমৃত ধারায় হঠাৎ-ই আমার উত্তপ্ত অস্তিত্ব শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

৫

ভোরের দিকে এক ঝলক সোনালী আলো আমার চোখের পাতা স্পর্শ করল। আমি জেগে উঠলাম। চোখ মেলে দেখলাম মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে সুমিতা ঘুমোচ্ছে অঘোরে।

শুভ্রা নেই

নবকুমার বসু

হয়তো এইভাবেই আরম্ভ করা যেতে পারতো যে, রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়েই মনে হল একটা মেয়ের চেনা মুখ চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। ডেকে ফেলতে পারার আগেই মানুষটা আমার দিকে ঘুরল। বিস্ময়ের হাসি নিয়ে এগিয়ে এলো। আমি নিজের ভেতরের আকাশ থেকে পড়া আশ্চর্য অনুভূতি চেপে রাখলাম। শুধু অস্ফুট স্বরে বলে ফেললাম, আরে শুভ্রা!

কিন্তু এইভাবেই আরম্ভ করা গেল না। যে মেয়েটিকে আমি বহুদিন পরে দেখে নিঃশব্দ আকুলতায় শুভ্রা মনে করেছিলাম, সে বুঝিয়ে দিল যে সে আমার পরিচিতা নয়। যার দিকে তাকিয়ে হেসে এগিয়ে এসেছিল, সে আমি নই। আমার পাশে কিংবা পিছনেরই অন্য কোন পুরুষ। ঠিক যে মুহূর্তে আমি চাপা উল্লাসে প্রায় খপ করে শুভ্রার মণিবন্ধ চেপে ধরতে যাব, তখনই ও সেই হাতটা তুলে আমার পাশের পুরুষটিকে বললো, আরে বাপ্পা!

আমি নিজের বিশ্বাস এবং স্মৃতির প্রতি পুরোপুরি আস্থা রাখতে না পেরে বোধহয় দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থায় একটু ঘুরেছিলাম। কি আশ্চর্য, আমি যাকে শুভ্রা মনে করেছিলাম এবং সেই শুভ্রা যাকে বাপ্পা মনে করেছিল, আসলে সে-ও বাপ্পা নয়। আমি এবার সেই চোখের ওপর ভেসে যাওয়া চেনা মেয়ের মুখের দিকে তাকালাম। ঠিক আমার মতই দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থায় এবার ও আমার দিকে ফিরল। ওর মুখে অদ্ভুত নির্ভেজাল সারল্য। হয়তো বা নিজে ভুল করে এগিয়ে যাওয়া অন্য একজনের চোখে পড়ে যাওয়ায় এক চিলতে লজ্জার হাসি। সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছে করল না। আমি এবার ঠিক এইভাবে আরম্ভ করলাম—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আপনি ত শুভ্রা, ঠিক না? শুধু এক্ষেত্রেই নয়। ইদানীং প্রায় সব ব্যাপারেই এই জিনিষ লক্ষ্য করছি। ভাবি এইভাবে শুরু হতে পারে কিংবা পারতো, অথচ তাকে পরিবর্তন করতে হয়। সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে আরম্ভ করতে হয়। যাকে ভীষণ চেনা মনে হয় সে অপরিচিত থেকে যায়। কিংবা অপরিচিতের বেড়া টপকে যখন সে পরিচিত হয় দেখি, আকস্মিকতার সেই আবেগ তখন অনেকটাই পানসে এবং জোলো হয়ে যায়। নতুন করে আবার তাকে ফিরিয়ে এনে

জাইয়ে রাখার উৎসাহ থাকে না। খুব চেনা যে সে যদি একবার অপরিচিত হয়ে যায় তাহলে আর তার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র টেনে পরিচিত হতে ইচ্ছে করে না। আমি বরং এবার থেকে তাকে একজন চেনাজানা অপরিচিত বলে মনে করতে থাকব।

কিন্তু এক্ষেত্রে এখন তার উপায় নেই। মনে হওয়ার মধ্যেই আমি যে চেনা শুভ্রাকে চেপে যেতে পারতাম তা আর হওয়ার নয়। আকস্মিকতার দ্বিধা আর অস্বস্তি কাটিয়ে শুভ্রা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর কোঁচকানো ঘন কালো বাঁকা ভ্রু বিস্মৃতির অন্ধকার কাটিয়ে ক্রমশ সোজা বিস্তৃত বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। চিনতে আরম্ভ করেছে। আমি জানি ওর গলা থেকে পোলভল্ট দেওয়া পরিচিত উল্লাস লাফিয়ে পড়বে। পড়ল।

—ওহ্, মা, বন্য তুমি! আবার ঢঙ করে জিজ্ঞেস করছ—আপনি শুভ্রা কিনা? আপনি! বলতে পারলে! সত্যি, তুমি—

শুভ্রার গলায় মাটির কলসীর জল ছলকে ওঠে।

ও চিনতে পারবে, পারতেই হবে—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। অথচ এই একটু আগেই যে মুহূর্তে আমার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া মুখটাকে আমি শুভ্রার বলে চিনে ফেললাম, অধীর আগ্রহ আর উত্তেজনায় প্রায় হাত ধরে ফেলার মতো একটা মূঢ় আত্মীয়তা দেখিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম—তখন ও মোটেও খেয়াল করে নি। হয়তো অচেনা কোনো একজনকেই বিশেষ পরিচিত বান্ধা বলে ভুল করার জন্য ছুটছিল। আর আমি নিখাদ বিস্ময়ে আস্থাহীন।

এখন শুভ্রা আমাকে চিনেছে। শুধু চিনেছে তাই নয়, আমাদের চেনা-শোনার মধ্যে যে পুরনো বয়সের নিবিড় সম্পর্ক ছিল তাও আবিষ্কার করে ফেলেছে। নয়তো ও আমাকে কিছুতেই বন্য বলে ডাকতে পারতো না। বন্য আমার নাম নয়। আমাদের তিনচারজন বন্ধুর মধ্যেই আমার ওই ডাকনামটা কবে থেকে যেন চালু হয়ে গিয়েছিল। শুভ্রা নয়, অন্য কেউ, সুব্রত আমার ঐ নামকরণ করেছিল। আমার চলতি দু অক্ষরের নামটা উল্টে নিয়ে একটা 'ভ' বসিয়ে দিয়েছিল পরের অক্ষরটায়। তাতেই পুরো শব্দটার মধ্যে এমন এক বিশেষত্ব এসে গিয়েছিল যে আমি পরিচিত হ'য়ে গেলাম ঐ নামেই।

আমার নাম নিয়ে সুব্রত বেশ কয়েকদিন কসরৎ করেছে। 'নব' নামটায় ওর খুব বিরক্তি। চাকর বাকর কিংবা রাস্তার লোক ছাড়া ও 'নব' নামটা আর

কোথাও ঝাপ খাওয়াতে পারে না। একদিন সন্ধ্যাবেলা মারলিন পার্কে শুভ্রাদের বাড়িতেই ও আমার নামটা আমূল পালটে দিল।

বেশ খানিকটা স্মৃতি হাতড়ে ফেলেছি। প্রায় একযুগের পুরোন। অথচ জায়গা মোটেই তার উপযুক্ত নয়। হোটেল রেস্তোরাঁয় গাদাগাদি পার্কস্ট্রিটে প্রায় সন্ধ্যা। তারওপর সামনে দাঁড়ানো বহুদিনের পরিচিত অনেক দিনের বিচ্ছিন্নতার পর হঠাৎ পাওয়া শুভ্রা। ওর কথাতেই চমক ভাঙে।

—এই বন্ধু, চুপ করে আছ কেন? কি রে বাবা, ডাকলে, আবার ··

হঠাৎ মাঝার মধ্যদিয়ে কিসব যেন দ্রুত গতিতে চলে যায়। শুভ্রা আমাকে এখন ঠিক আগের মতোই চিনে ফেলেছে। এই অল্প দু এক মিনিটের মধ্যেই। অথচ যাকে চিনেছে সে কি এই আমি? যে আমি সেই তখনকার চেনা থেকে দশবার বছরের বড়। আমার কথা নয়, শুভ্রা নিজেই কি বিশ্বাস করবে, মানতে চাইবে যে সেই আমি আর এই আমি'র মধ্যে অনেক বছরের সময় অতিক্রান্ত? যে সময় অনেক কিছু দেয়, আবার অনেক কিছু নিয়েও নেয়। কত কি পাওয়া যায় আবার কত কি হারিয়ে যায়। কি দরকার সেই হিসেবের মধ্যে গিয়ে। কিই বা প্রয়োজন আবার সেই পরিচিতির পুরোন চাটনি তারিয়ে তারিয়ে চেটে চেটে আস্বাদন করার। এই তো একটু আগেই বলতে গেলে শুভ্রার চোখের ওপর দাঁড়িয়েই অপরিচিত আমি অদৃশ্য থেকে গিয়েছিলাম।

নিঃসাড়ে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল – মাপ করবেন, আমি ভুল করেছি। হয়তো আপনিও আমাকে ভুল করছেন অন্য কারুর সঙ্গে।

—মারব এক থাপ্পড়। শুভ্রা রাস্তাঘাট ভুলে বটুয়াশুদ্ধ ডানহাত তুললো। আশ্চর্য, শুভ্রা কখনও এতো স্মার্ট এবং ফ্রি ছিল না। বহরমপুরের রাজবাড়ির মেয়ে বলেই বোধহয় ওর সব কিছুর মধ্যেই একটা সূক্ষ্ম সংস্কারের বেড়া ছিল। আলতোভাবে ওকে ঘিরে রাখতো সবসময়। আমাকে আর কিছু বেশি ভাববার সুযোগ না দিয়ে শুভ্রা আবার বললো – বন্ধু, তুমি এতো অন্যরকম হয়ে গ্যাছো? আর একবার 'আপনি' বলে ছাখো।

—আপনি ভুল করছেন, আমার নাম বন্ধু নয়। বললাম। বলে ফেললাম। আর ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল কয়েকটা বাথার সুতো বুকের মধ্যে জড়িয়ে গেল।

—আমি জানি স্যার। শুভ্রা আমার হাতের আঙুলে চিমটি কেটে দাঁত চেপে বললো।—জানি তুমি বন্ধু নও। তুমি নব এবং তৎসহ কুমার। চলো কোথাও

গিয়ে বসি। এতো মোটা হলে কি করে? কবে?

—আমি বলছি, আপনি গুলিয়ে ফেলেছেন। আপনি যে কটা নাম বললেন, তার কোনটাই আমি নই।

আমি ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললাম—আপনি ভুল করছেন।

শুভ্রা স্থির দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। ওর চোখে কৌতুকের গোধূলিতে সন্ধ্যার ছোঁয়াচ।

—তবে তুমি কে?

—সেটা আলাদা প্রশ্ন। মিইয়ে গিয়ে উত্তর দিই।

—কিন্তু আমি তো শুভ্রা! সেই বালিগঞ্জের, মালিন পার্কের···তু-তুমি, মানে আপনি আমাকে তাহলে চিনলেন কি করে?

মুখ ঘুরিয়ে নিই। চোখ ফিরিয়ে নিই শুভ্রার মুখের ওপর থেকে। পুরোন স্মৃতিরা তবু ভিড় করে আসে মাথায়। শুভ্রা আর নিজের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না। তুমি ছেড়ে আপনি বলছে। আস্তে বলি—আমি ত বলেছি, আমার ভুল হয়েছে। আমায় মাপ করুন। আমি আপনাকে—

—ইমপসিব্‌ল! আমি যে শুভ্রা, এটা ত আমি নিজে জানি—তুমি, মানে আপনি যদি অস্বীকার···করেন—

শুভ্রার পুরো মুখটায় এখন আস্থাহীন অবিশ্বাসের অন্ধকার ছেয়ে আসছে। আমি তাকাই না। তাকাতে পারি না। মুখ ঘুরিয়েই বলি—আমি যাকে ভেবেছিলাম তারও হয়তো ঐ নাম। কিন্তু আপনি নন। সে অন্য মানুষ, অন্য শুভ্রা।

সোজাসুজি তাকাই না। চোখের তারা ঘুরিয়ে আনি একটু একটু করে। আড় চোখে ওর দিকে দেখবার চেষ্টা করি। পারি না। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আসি সামনে। শুভ্রা দাঁড়ায় নি। চলে গেছে। আর একবার চলে যাওয়া শুভ্রাকে দেখার জন্য তাকাই। তাকিয়ে খুঁজি। নেই।

অবিনাশ কি করবে?

সুব্রত সেনগুপ্ত

লাল জামা পরা শৈলেনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে যদি হঠাৎ কেউ অপমান করে বসে, তুমি কি করবে? —শৈলেন বলল, হঠাৎ আমাকেই এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছো? —বললাম, এমনি। আচ্ছা তুমি কি প্রতিশোধ নিতে পাল্টা অপমান করবে?

শৈলেন আমাকে বাধা দিয়ে বলল, তুমি ভুল করছো। একে প্রতিশোধ বলে না। —কি বলে তা হলে? —যাই বলা যাক, তুমি এমন ভাবে বলছো যেন সব দোষ আমারই। —কি বলছো তুমি! তোমার দোষ—তোমার কথা আমি আবার কখন বললাম?

—তুমি বলতে চাও বিনু তোমাকে কিছু বলেনি?

—তোমার কথা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বিনু আমাকে কি বলবে?

শৈলেন আমার কথা হয় তো বিশ্বাস করলো না, বললো, তুমি আমার আর বিনুর ব্যাপার কিছুই জান না—তবে এসব তুমি আমাকেই বা বেছে বেছে বলতে এলে কেন?

সত্যি শৈলেন ছেলেটার কি হলো? জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপারটা কি বলতো? বিনু কি করেছে?

ও পাল্টা জিজ্ঞেস করলো, তার আগে তুমি বল, তোমার প্রশ্নের অর্থ কি?

—অর্থ খুব সোজা। আমি গল্প লিখতে গিয়ে একটা চরিত্র নিয়ে মুশকিলে পড়েছি। তাকে নিয়ে কি করবো—সেই বা কি করতে চায় বুঝতে পারছি না। —ওহ্, গল্প! তোমার গল্পের চরিত্রটার নাম কি? —অবিনাশ। —অবিনাশ কি অপমান করেছে, না অপমানিত হয়েছে? —হয়েছে। —হয়েছে? আশ্চর্য তারও কি বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া।

—আগে ভেবেছিলাম বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করবো কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে বান্ধবীর সঙ্গে হলেই ভাল হয়। সেজন্য একটু নতুন করে ভাবতে হবে।

শৈলেন জিজ্ঞেস করল, কেন, নতুন করে ভাবতে হবে কেন?

—ভাবতে হবে না ? ছেলে-ছেলে আর ছেলে-মেয়ে কি এক রকম সম্পর্ক ? কি তফাৎ ? —তফাৎ ? ধর একটা মেয়ে, যে তোমার বন্ধু—গল্পের খাতিরে ধরা যাক প্রেমট্রেম নয়।

—প্রেমিকার কাছে অপমানিত হলে অবিনাশ আর কি করবে ? একটু দুঃখ পাবে। প্রেমিকা ধরা যাক গোপা—গোপাকে গিয়ে বলবে, বলবে কাল তুমি আমাকে যা অপমান করেছ, আমার সঙ্গে এরকম করতে পারলে ? তখন গোপা লজ্জিত হয়ে হয়তো বলবে, ওসব কথা বললে জান না আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় —কেন তুমি ওসব বলতে গেলে ? এই পর্যন্ত বলে গোপা অবিনাশের জামার বোতাম খুটতে থাকবে। খুটতে খুটতে গলা নামিয়ে, তুমি এখনও রাগ করে আছ ? —তখন অবিনাশ বলবে, বেশ গম্ভীর গলায় অবশ্যই, গোপা, তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

—গোপাও একটু সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি শাস্তি ? —তখন অবিনাশ চোখ বুঁজে বলবে, তোমার বাক্যবানে আমার হৃদয় জর্জরিত এখন জ্বালা দূর করার জন্য আমাকে একশটা চুমু খেতে হবে—

মুখ বিকৃত করে শৈলেন বলতে লাগল, অবিনাশ এর পর বলবে, তোমার নরম বুকে পঞ্চাশবার হাত দেব, কি অসভ্য মেয়ে তোমার ব্লাউজের বোতামগুলো পিঠের দিকে কেন, বুকের দিকে হলে সুবিধে হতো, গোপা বলবে আমার ব্রা-র হুকটা খুলে দাও না—বাস্টার্ড।

আমি শৈলেনের ক্রোধে যার পর নেই বিস্মিত হলাম। বললাম, তুমি এতো সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন, অবিনাশ তো সত্যিকারের মানুষ নয়, গল্পের একটা চরিত্র।

শৈলেন একটুও শান্ত না হয়ে বলল, হোক চরিত্র তাই বলে যা খুশি করবে, যা তা বললে হবে না কি ? তুমিও ভাবছো গোপা না কে মেয়েটা এতই সাধারণ দু চারটে কথা বলেছে যে পরদিন অবিনাশের চুমু খাওয়ার কথা বলতে প্রবৃত্তি হবে ? তার একটা আত্মসম্মান বোধ থাকবে না ? তোমার চরিত্র বলে তুমি তাকে দিয়ে যা খুশি করাতে পার না।

আমি ভাবলাম দূর ছাই, এই লোকটা নিজের অপমানের সঙ্গে অবিনাশেরটা গুলিয়ে ফেলছে। বিনু ওকে কি এমন কথা বলেছে জানি না কিন্তু বিনু আর শৈলেনের বোকা গোপা আর অবিনাশ কেন বইতে যাবে তা তো বুঝতে পারছি না।

শৈলেন হঠাৎ বলল, বিনুর ওপর আমার আর কোনো রাগ নেই। আমি

সুযোগ খুঁজিনি ঠিকই কিন্তু প্রথম সুযোগেই সবার সামনে ওকে পাল্টা অপমান করেছি। এখন ওর কথা ভাবতে গেলেই ওর সেই অপমানিত বিব্রত মুখটা মনে পড়ছে। আমি বললাম, আমি তো আগেই বলেছি প্রেমিকার ওপর রাগটাগ করে থাকা যায় না—শৈলেন বাধা দিল, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। আমি ওকে পাল্টা অপমান না করলে আমার এখনও রাগ থাকতো, থাকতো না? আমিও তো রক্ত মাংসের মানুষ। এখন আবার খারাপ লাগছে। আমার কি করা উচিত ছিল? এখনই বা কি করা উচিত?

শৈলেনের কি করা উচিত ছিল এখনই বা কি করা উচিত আমি বুঝতে পারি না। আমারও অবিনাশকে নিয়ে মুশকিলে পড়তে হবে মনে হচ্ছে। গোপার কাছে গিয়ে চুমু দাবী করলেই সব মিটে যাবে এতো হালকা করে দেখার জিনিস এটা নয় বোধ হয়। হলে পৃথিবীতে তো কোনো সমস্যাই থাকতো না।

শৈলেন আচমকা জিজ্ঞেস করল, বিনুর বাড়িতে একবার যাবো এখন?

শুধু কথায় নয় শৈলেনের কথা বলার ধরণে চমকে উঠলাম। শৈলেন আবার বললো, প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল কাল বিকেলে আর পরেরটা আজ দুপুরে। কিন্তু জানো প্রথমটা মানে বিনু আমাকে যা যা বলেছিল তার চাইতে তোমার অবিনাশের কথা শুনে, আমার পরের ঘটনাটা বেশ মনে পড়ছে।

আমি বুঝতে পারি না, অবিনাশের কথা শুনে শৈলেনের কেন এখন এই রাতে বিনুর বাড়িতে যাওয়ার কথা মনে হবে? অবিনাশ শৈলেনের পথে চলবে, না শৈলেন অবিনাশকে অনুসরণ করবে? ক্রমশ মনে হচ্ছে অবিনাশ আমাকে সমস্যা থেকে আরও সমস্যার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কি করতে চায় ও? শৈলেনের মতো ও যদি গোপাকে সুযোগ পেয়েই পাল্টা অপমান করে বসে? কিন্তু শৈলেন যা বলছে অবিনাশের দৃষ্টান্তে ও বিনুর বাড়িতে যেতে চাইছে।

শৈলেন বলতে লাগল, বিনু প্রথমে ওর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিল তার বদলে আজ দুপুরে কফিহাউজে সে কি ভাবে বিনুকে সবার সামনে জব্দ করেছে। বলে শৈলেন চলে গেল। হঠাৎ দেখি শৈলেনের পাশে পাশে চলেছে অবিনাশ। একি। শৈলেন যাচ্ছে তার প্রেমিকা বিনুর কাছে। সেখানে গিয়ে অবিনাশ কি করবে? ও যাচ্ছে কেন? অবিনাশ আমার কথা শুনছে না। বিনুদের সত্যিকার বাড়িটা কি রকম আমি জানি না তবু আমি দেখতে পাচ্ছি অবিনাশ আর শৈলেন একটা একতলা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অবিনাশকে বোঝানো দরকার এভাবে তার যাওয়া চলতে পারে না তার কারণ, গোপাকে

সে এখনই সবার সামনে জব্দ করেনি ফলে মিটমাট করার জন্য তার ব্যস্ত হয়ে ওঠার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আর যেতে হলে তাকে গোপার বাড়িতে যেতে হবে, বিনুর বাড়িতে নয়।

হঠাৎ দেখি বিনুদের রাস্তার দিকের ঘরের দরজা খুলে যাচ্ছে। শৈলেন কোথায় গেল? ওকে আর দেখা যাচ্ছে না। বিনু দাঁড়িয়ে আছে। বিনুকে দেখেই অবিনাশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বিনুকে জিজ্ঞেস করল, বিনু কাল দুপুরে তোমার কোনো কাজ আছে?

বিনুর গায়ে জামা নেই। শুধু ব্রা, আঁচলে বুক খুব ভাল করে ঢাকাও পড়েনি। সেদিকে নজর না দিয়ে বিনু হেসে বলল, কেন?

কি হচ্ছে? ওরা এভাবে কথা বলছে? ওদের মধ্যে তো আলাপই নেই। বিনু বলল, ভেতরে আসুন। ভেতরে দুজনে বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসল। অবিনাশ একবার বিনুর কাঁধ একবার বুকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কি কাল দুপুরে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

বিনু কি ভাবল তারপর বলল, নেই। কেন?

—সিনেমা যাবে? আমার কাছে এলিটের দুটো টিকিট আছে ম্যাটিনি।

বিনু কি জিজ্ঞেস করল, কেন গোপার কি হলো? কিন্তু জিজ্ঞেস করেই আবার বললো, যাবো।

আর বুঝতে বাকী নেই এরা শৈলেন গোপার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু এতো সহজে অবিনাশকে আমি যা খুশি তাই করতে দিতে পারিনা। অবিনাশ কি চায়? একটা হেস্তনেস্ত চায়? তারপর দরকার হলে শৈলেনের মতো মিটমাট করতে ছুটবে? গল্পের বিনুই বা কি চাইছে? এই বিনু অবিনাশের সামনে যে ভাবে গায়ে জামা না দিয়ে কথা বলছে, হেসে লুটিয়ে পড়ছে, জানতে পারলে শৈলেনের খুশী হওয়ার কারণ নেই।

পরের দিন শৈলেনের সঙ্গে দেখা হল। কাল রাতে ও বিনুদের বাড়ি গিয়েছিল। শৈলেনকে দেখেই বিনু তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

শৈলেনের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। চোখ বসে গেছে। চুল উসকোখুসকো। গলার স্বরটাও কিরকম লাগছে। ওকে কি বলবো আমি? কিছুক্ষণ পর শৈলেন করুণ মুখে হাসি ফোটানোর বৃথা চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল, কি তোমার অবিনাশ এখন কি করবে?

প্রতিভা

দিলীপ সেন

গভীর রাতে আলোর ঝিলিমিলি দেখে আশ্বস্ত হল নিতাই। স্ত্রীপুত্র-কন্যাকে ঘুম থেকে ডেকে উঠিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করল, দেখ দেখ তোমরা যে বিশ্বেস কর না, এই দেখ। ওদের কাঁচা ঘুম ভাঙাতে ভরসা পেল না।

নিতাইর শ্বশুরবাড়ীর সবাই ওর প্রতিভা মেনে নিয়েছে। কিন্তু এখন এই রাত দুপুরে অবিশ্বাসী লোকগুলোকে পায় কোথায়।

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যেগুলো পাঁড় মাতাল, তাদের হয়ত রাস্তাঘাটে এখনও পাওয়া যেতে পারে।

নিতাই ভাবে প্রতিভার এইতো দস্তুর। কতদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে।

যে কটা সাহিত্য পত্রিকা আছে তাতে উপন্যাস, উপন্যাসোপম বড় গল্প, কিংবা নিদেন পক্ষে ছোটগল্পও ছাপা হয়নি কিন্তু বায়োস্কোপ পত্রিকাগুলিতে নিতাই সর্বজনবিদিত। প্রকাশক অগ্রিম টাকা দিয়ে সকাল-সন্ধ্যে তাগাদা করে।

সেই ঝিলিকের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ ব্যথা হয়ে এল নিতাইর। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। অস্বস্তিতে ছটফট্ করে। বুকের পুরনো ব্যথাটা চাড়া দিয়ে ওঠে। সেই স্বপ্নের দিনগুলো নিতাই ভাবে, কী নিতান্তই অলীক? স্বপ্ন না হ্যালুসিনেশন?

নিতাই ভাবে তাকে দিল্লী যেতে হবে। সব কিছুর জন্য নিজেকে তৈরী রাখার নামই তো সপ্রতিভবা। কখন ডাক এসে যায় কে বলতে পারে? পুরস্কার তাকে পেতেই হবে। পুরস্কার পাবার পর নিন্দুকেরা বুঝবে সে কত বড় লেখক। পুরস্কার না পেলে এদেশে কেউ লেখক হয় না। আলোকিত ঘরে নিতাই বিছানায় উঠে বসে।

লেখা-ফেকা ছেড়েই দেবে একসময় ভেবেছিলো নিতাই সামন্ত।

কী হবে লিখে?

কার জন্য সে লিখবে?

আজকাল কোনো একটা পত্রিকার গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে চামর দোলাতে না পারলে কেউ লেখা ছাপে না।

তবে এ অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে নিতাই সামন্ত। নানা কৌশল ফিকির করে এখন দুটো পয়সাও পায় লিখে। বায়োস্কোপ পত্রিকাগুলো হাতিয়ে নিয়েছে। এ দিক দিয়ে ওরা দুষ্টুমি করে না। লিখে যা পায় ওয়াইফ এবং ওয়াইফ-ইন-ল দুটো খরচাই মোটামোটি উঠে আসে।

নিতাই গৌরব বোধ করে।

আলোর ছটায় ঘর পরিপূর্ণ। নিতাইর মাথা ঘুরে যায়। মাথার মধ্যে আলোর পোকা ডানা মেলে ওড়ে। লোভ সামলাতে পারল না। বউকে আর বড় ছেলেকে ডেকে তুলল। বলল, দেখ, একজন প্রতিভাবান দেখ, আমার গা থেকে কেমন দীপ্তি বেরোচ্ছে। ঘর আলোয় আলোময়।

ছেলে বিস্মিত হলো, তাকিয়ে দেখলো ইদিক উদিক। তারপর বলেই ফেললো, বাবা ওটা ঘরের আলো নয়, রাস্তার আলো ঘরে এসে পড়েছে। তুমি শুয়ে পড়।

প্রচ্ছন্ন নিষাদ

কামাল হোসেন

—দিন দিন সব কিছু কেমন ছোটলোক বনে যাচ্ছে……নাকটা একটু উঁচিয়ে জলিল মিঞা বেশ প্রসন্ন চিত্তে বললেন। যেন এরকমই বলা উচিত অথবা বেশ ভাববার মতো একটি নতুন কথা বলে মধ্যবিত্ত মানুষ যেমন অল্প অহংকার বোধ করে, তাই এরকম বলে ফেলা।

—হ্যাঁ যত্তো সব · । বিশ্রীভাবে হাই তুলে দেওয়ালে টাঙানো পুরোনো সুইস ঘড়িটায় চোখ রাখলেন জলিল মিঞা। মধ্য পঞ্চাশ। হাঁটলে অল্প কুঁজো দেখায়। রোগা বলেই বোধহয়। অফিস থেকে ফেরবার পথে প্রতিদিনই ইয়াসিন ডাক্তারের এই ডিস্পেন্সারীতে বসে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে যান।

আড্ডার নেশায় আলোচনা বেশ জমে ওঠে। ইদানীং যে পরিবর্তনের বাতাস এই মফস্বল শহরের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে অন্য স্বাদের আমেজ এনে দিচ্ছে, স্বভাবতই সে-সব নিয়ে চিন্তাভাবনার কিছু আছে।

সেই পুরোনো কালের আদলে সাজানো ডিস্পেন্সারীতে ওপাশে পার্টিসানের ধারে কবীর কম্পাউণ্ডার ঝিমোচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-চারটে মশা হাতে-পায়ে বসছে, চটাস চটাস শব্দ, আর পুরোনো ফ্যানের ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ।

এদিক থেকে কবীরের বিরল-কেশ নারিকেল আকৃতির মাথাটার এক পাশ দেখা যাচ্ছে। চোখ মুখের চামড়ায় সময়ের শ্রম-অবস্থান। অনেক চিহ্ন, অনেক স্বপ্নহীন দীর্ঘ কর্মজীবনের গলার স্বর। আধো ঘুম, আধো চেতনাতে ঠিক বিশ কিংবা তিরিশ বছর আগেকার কবীরকে এখনকার কবীর চিনতে পারে না। ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে এপাশে মাথা ফেরায়। ডাক্তার সাহেব কথা বলছেন। কবীর কান পাতে। কিছু বোঝে না। বোঝবার চেষ্টা করে না। এরকম কত কথাই তো সে শুনেছে। কত কিছু ঘটে গেল। এখন যেন আরো দ্রুত সব কিছু ঘটে যাচ্ছে।

অনেক দিনের পুরোনো অভ্যেস নিয়ে কবীর প্রস্তুত হবার চেষ্টা করে। আশা করে এখুনি হয়ত ডাক্তার সাহেব বলবেন—খুব যত্ন করে মিক্শ্চারটা তৈরী করবে কবীর—বিশ্বনাথবাবুর ছোট মেয়ের অসুখটা দু'দিনে সারিয়ে দিতে হবে, নইলে সামনে সোমবার কলকাতায় দিদিমার বাড়ি যাওয়া হবে না। বেচির আবার

চিড়িয়াখানার নতুন হাতিটা না দেখা হলে বড়লাট খুব রাগ করবেন তো। নিজস্ব কৌতুকে হো হো করে ইয়াসিন ডাক্তার ডিস্পেন্সারী কাঁপিয়ে তুলতেন।

বিশ্বনাথবাবুর আট বছরের ছোট মেয়ে ঝুমকি ছুটে কবীরের কাছে এসে ছুটত। হাজার রকমের ছেলেমানুষী প্রশ্ন—অই লাল শিশিটায় কী আছে, অই বড় বড় বাকসোতে কী কী থাকতে পারে, এমনি সব গবেষণা। সেই ছোট খুকী কত বড় হল, বিয়ে হল। তারপর বাড়িতে ডেলিভারী কেসও ইয়াসিন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছিল। তারপর···তারপর···হাতের কাছে কিছু না খুঁজে পেয়ে আঙুলের কড়ি গুণে ভাববার চেষ্টা করল কবীর···এক···দুই··· ···দু'কুড়ি মানে চল্লিশটা বছর কেটে গেল। সে কবীর কম্পাউণ্ডার, লোকে বলে পাশ করা নতুন ডাক্তারের থেকেও ভালো ওষুধ দিতে পারে সে। চল্লিশ বছর···কোন রোগের কী ওষুধ—সব তার মুখস্থ, নাকি স্মৃতি বুঝি ক্ষীণ বিদ্যুতের মতো তার পাতুর মস্তিষ্কের কোষে কোষে খেলা করে যায়।

—অঙ্গলের বেদনাটা আবার বেড়ে উঠছে হে ডাক্তার, ট্যাবলেট-ফ্যাবলেট যা-হোক কিছু দিও।

একটু সরস ভঙ্গিতে বলবার চেষ্টা করেও বসির মিঞা বুঝতে পারেন, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। একটু আগে ইয়াসিন ডাক্তার সে কথাটাই বোধহয় প্রকারান্তরে বলতে চাচ্ছিলেন—আমরা যাই বলি না কেন হে, ওদের গায়ে আঁচড়টিও কাটবে না।

উৎসবের লগ্ন শেষ হয়ে গেলে যাদুকর এমনি করেই বোধহয় রঙীন রুমাল উড়িয়ে বিদায় অভিনন্দন জানায়। এক বিষম শক্তিশালী অদৃশ্য অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা ইদানীং অস্থিতে মজ্জায় অনুভব করেন বসির মিঞা।

বসির মিঞা ইয়াসিন ডাক্তারের সমবয়সী। এল-এম-এফ পাশ করা ইয়াসিন সেই কত দিন আগে ছোট ডিস্পেন্সারী খুললেন এ শহরে। তার আগে কয়েকজন কবিরাজী, হোমিওপ্যাথী, হেকিমি আর হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে লোকে যেত। কতটুকুই বা বড় ছিল এ শহর। একটি মাত্র ইস্কুল, সকালে গোটা কয়েক মেয়ে, দুপুরে ছেলেদের। শিক্ষকের সংখ্যাও ছিল অল্প। আর ছিল পুরোনো অকেজো একটি হাসপাতাল। ধর্মপ্রচারের পবিত্র উদ্দেশ্যে মিশনারীরা একদা স্থাপন করেছিলেন। সাহেব ডাক্তার মারা যাওয়ার পর আর কেউ আসেননি এই আধা গ্রাম আধা শহরে। ট্রেন ব্যবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। মাইল খানিক দূরে রেল ইস্টীশান। কতগুলো লজঝড় সাইকেল রিক্সা ঘোড়ার

গাড়ি ওই বহু দূর যাওয়ার প্রবেশ পথটির সঙ্গে শহরের সংযোগ রক্ষা করত।

জলিল মিঞা কিংবা ফজল মিঞার বয়স বসির মিঞাদের থেকে কিছু কম। তবু বন্ধুত্ব আটকায় নি। একটা বয়সে হয়ত কয়েক বছরের পার্থক্য আর কোনো বাধা সৃষ্টি করেনা, তখন সকলে একই প্রজন্মের বাসিন্দা, একই সুড়ঙ্গ দিয়ে দল বেঁধে চলেছেন, সেই ছায়া ঘেরা নিবিড় গোপনতায় কখন কার পথ চলা শেষ হয়ে যায়, তারই প্রতীক্ষা যেন।

ফজল মিঞার মুদির দোকান। বসির মিঞার মতো এখনো নিজের ব্যবসায় নিজেকে আটকে রাখেন নি। পুরোপুরি অবসর জীবন কাটাতে চাইছেন। সস্ত্রীক আজমীর শরীফ ঘুরে এসেছেন। আজকাল ধর্মকর্ম নিয়ে আছেন। দুপুরবেলায় ছেলের সঙ্গে আহার, খুচরো কথাবার্তা, চালের দামটা এবার বাড়বে মনে হচ্ছে, ডালের স্টকটা ভালো করে রাখতে হবে, কিংবা বউ-বিবির শরীর সারছে না কেন, পীর সাহেবের দরগায় মানত করলে মন্দ হয় না……এমনই কী হওয়া উচিত অথবা কী হলে জীবনটা আরো সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠবে, তার জন্য চিন্তাভাবনা।

সন্ধ্যেবেলায় ইয়াসিন ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীতে বসে এই আড্ডা। শহরের অনেক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে তেমন কিছু হাওয়া বদল ঘটেনি। শুধু আস্তে আস্তে রোগীর সংখ্যা কমে আসছে। সন্ধ্যের পর প্রায় ফাঁকা থাকে। শহরে এখন অনেক নতুন ডাক্তার। নতুন সরকারী হাসপাতালেও লোকে ভীড় জমায়।

দেওয়ালে ঝোলানো সম্পূর্ণ বাবচ্ছেদ করা মানুষের ছবির শরীরে ধুলো জমছে। ওষুধ-কোম্পানীর বিজ্ঞাপনেও পুরোনো সংলাপ। আজকালকার ছোকরা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা ইয়াসিন ডাক্তারের কাছে কদাচিৎ আসে। সকলেরই জানা হয়ে গেছে দেশী ওষুধের কোম্পানীতে তাঁর আস্থা নেই। আড়ালে তাঁর এস-এম-এফ ডিগ্রীকে ব্যঙ্গ করে সকলে বলে-লম্বকো ডাক্তারের বড্ড বাড়াবাড়ি!

—হ্যা ! ভারিক্কীভাবে অন্যমনস্ক জলিল মিঞা হয়ত সাড়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তাটাও বিষাক্ত সাপের মত ছোবল হানে। মনে মনে হিসেব কষে দেখেন, বসিরভাই তো বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। এক ছেলে কলকাতায় কাঠের ব্যবসা দেখছে। ছোট দু'টিকে নিয়ে বসিরভাই এই বাটের ওপর বয়সেও ব্যবসাতে বেশ মেতে আছেন। ইয়াসিন ডাক্তারও বয়সের সীমাবদ্ধ

জমিতে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনের বেশীই হয়ত রোজগার করে নিয়েছেন। ছেলে জার্মানী থেকে এনজিনিয়ারিং পাশ করে এদেশে এসে বোম্বেতে বিদেশী ফার্মে চাকরী করছে। মেয়েটা অবশ্য বিধবা হয়ে কিছুদিন হল বাপের ঘাড়ে এসে পড়ে আছে। তবে ইয়াসিন ডাক্তারের তাতে কিছু অসুবিধে হবার কথা নয়। বরং একদিক দিয়ে ভালোই, কেননা স্ত্রীও বছর দুয়েক পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী; বিধবা মেয়ের সেবা খোদাতালার রহমৎ বই কি। নিজের বাড়ি, বাগান জমিজমা সমেত দায়দায়িত্বহীন দিব্বি জীবন!

বস্তুত যাত্তার পরের বাঁকে কী রয়েছে, এরকম চিন্তা নিয়েই জলিল মিঞা ছোটবেলা থেকে মনে মনে কিছুটা ভীরু। মধ্য পঞ্চাশের শুকনো পাটাতনে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু সুতো দিয়ে গেঁথে চলেছেন অসংখ্য উৎসবের নিমন্ত্রনলিপি। নির্বোধের মতো একদা জীবনের সব থেকে মূল্যবান মুহূর্তগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে জন্তুর মতো বিচ্ছিন্ন রীতিপালনে অভ্যস্ত হয়ে গেছলেন। বোধবুদ্ধি তো কোনোদিনই হল না। এখনো সেই একই রকম নিয়মরক্ষার নামতা পাঠ। মনে মনে বেদনা অনুভব করেন তিনি। শান্তি কোথায়? কোন ঘাস খড় পাতার বিছানায় সঞ্চিত আছে কাঙ্ক্ষিত ওম?

একটা ছোট সরকারী অফিসে তাঁর চাকরী। স্বাভাবিকভাবেই নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। দিন রাত্তির বউ-ছেলেমেয়েদের সমালোচনা ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মাঝে মাঝে তিনিও মনের ভিতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন, আবার ধীরে সংযত হয়ে গুটিয়ে যান, কোনো কিছুর প্রতিবাদ অনেক দিন স্থগিত রেখেছেন তিনি।

বুকের ভিতরে জলজলে চোখগুলি মিটি মিটি চায় কেমন যেন হিম হয়ে যান জলিল মিঞা, চারপাশে শব্দের কোলাহল, সমুদ্রের কিনারায় পুত্র-কন্যাদের দাঁড় করিয়ে হাতে মেসিনগান তুলে নেন তিনি প্রজাপতির ডানা কাঁপতে কাঁপতে জামার আস্তিনে আশ্রয় নেয়। তেল চিটচিটে গেঞ্জিতে অনেক স্বেদবিন্দু বাদামী হয়। সুড়ঙ্গের পিচ্ছিল পথে হামাগুড়ি দিয়ে জলিল মিঞা ধূর্তের মতো কুয়াশার নীল পোষাক সমস্ত শরীরে জড়িয়ে নেন। মাঝরাত্তিরে ভাঙা তক্তপোশে শরীর বিছিয়ে বিগত যৌবনা স্ত্রীর আকর্ষণহীন দেহাবয়ব, যা খসখসে ত্বকে আবৃত কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নয়, আলতোভাবে স্পর্শ করেন। তখন জ্যোৎস্নাও বাধা দেয়।

রাত দশটা বাজতে গেল। এগারোটার সময় ডিস্পেন্সারীর দরজা বন্ধ করেন ইয়াসিন ডাক্তার। অনেক দিনের অভ্যেস। রোগী না এলেও বজায় রেখেছেন।

ইয়াসিন ডাক্তার জলিল মিঞার দিকে তাকিয়ে বললেন —তোমার তো রিটায়ারের সময় হয়ে এল হে।

অনেক জানা কথাও এভাবে সময় কাটানোর তাগিদে জেনে নিতে হয়।

—হ্যাঁ, ইয়াসিনভাই। বিড় বিড় করে ঘাড় গুঁজে কিছু বলে চলেন জলিল মিঞা। মাথার ওপরে টাঙানো হলুদ আলোর স্পর্শে লম্বা লম্বা সেবেলে গুমুদের আলমারির ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। এরকম উৎসাহহীন নিয়ম বেঁচে থাকার কোনো মানে হয়? অবসর, আহা, লোভনীয় প্যাকেটে সাজিয়ে সেই অনন্ত ছুটির দিন একরকম বিনামূল্যে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

—শুনেছেন, মন্টু মিঞার মেয়ের খবরটা। ফজল মিঞা তাঁর চাল-ডাল-তেলের ব্যবসার অভ্যেসটা এখনো ভোলেন নি।

—বাদ দাও···সময়ের এই জঘন্য কেনাবেচার আতঙ্কিত বসির মিঞা ভাবতে চেষ্টা করেন মন্টু মিঞার কোন মেয়েটার কথা ফজল বলতে চাইছে।

—তা যা বলেছেন ভাই। বাঁধানো দাঁতের ওপর হলুদ আলো ঝকমক করে। ঈষৎ লজ্জিতভাবে ফজল মিঞা আস্তে আস্তে খবরের জট ছাড়ান—দিন দিন দেশটা ছোটলোক বনে যাচ্ছে ··

তারপর কিছুক্ষণ চারজন প্রৌঢ় মানুষ আরো নিবিড় হয়ে রস আস্বাদন করেন এই নতুন সংবাদের, যা নাকি মন্টু মিঞার মেয়ের শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে কওয়াম, তমুদ্দিন এবং রুচিগত অনেক প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। ক্ষণিক আলো-আঁধারিতে চারজনেই একটু বিমনা হয়ে যান। মন্টু মিঞা এখন কী করবেন? ছাতা মাথায় ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ মিশে যাওয়া এত সহজ?

কবীর একটু সজাগ হয়। নিষিদ্ধ আলোচনার গন্ধ পেয়ে কুকুরের মতো সে কান-খাড়া করে · টুকরো টুকরো শব্দের ইঙ্গিত·· হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ফুলবাবু ছেলেটা প্রত্যেক বিকেলে গাড়ি হাঁকিয়ে আসত···কলেজে পড়লেই একালের মেয়েরা একেবারে বেহায়া হয়ে যায় আগেও কি মেয়েটা অমুকের ব্যাটার সঙ্গে ঘোরেনি ···তোবা তোবা···কবীর ঘাড় নাড়ে। কিছু কিছু সে বোঝে। কিছু বুঝেও বুঝতে পারে না। আচ্ছা, জোয়ান বয়সে তার নিজের একটা মেয়ে হলে অ্যাদ্দিনে ডাগরটি হত। সেও কি এমনি একটা খাঁচায় স্বেচ্ছায় আশ্রয় নিয়ে সারাক্ষণ ছটফটিয়ে মরত? সে খাঁচা কি প্রেম? হ্যাঁ, যৌবনে কবীরেরও কি ইচ্ছে হয়নি কোনো ভরন্ত মেয়ের সোহাগ পাবার? অল্প শিক্ষার দৌলতে বটতলার চটি বইগুলোতে চোখ বুলিয়ে মোহব্বত, ভালোবাসা ইত্যাদি শব্দগুলি

খুব পরিচিত কবীরের।

ইয়াসিন ডাক্তার নিজেই পছন্দ করে কবীরের বিয়ে দিয়েছিলেন। হামিদা খুব হাসিখুশি মেয়েছেলে ছিল।

বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরও হামিদা ছেলেপুলের মা না হওয়ায় ইয়াসিন ডাক্তারের কাছে নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছিল কবীর।

নানারকম পরীক্ষা-পর্ব শেষ করে ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন— তুমি শালা একটা ঢ্যামনা হে কবীর। বাপ হবার সৌভাগ্য নিয়ে আসনি। একেবারে জেনেশুনে একটা সোমত্ত মেয়ের জিন্দেগীটা নষ্ট করে ফেললাম হে।

চেপে থাকতে না পেরে বুকের কষ্ট হালকা করবার জন্যই বোধ হয় শোবার সময় বিবির কাছে নিজের অক্ষমতার কথা ফাঁস করে দিয়েছিল কবীর।

সে রাত্তিরেই ঘটেছিল ভয়ানক ঘটনা। শাড়ি পাকিয়ে দড়ির মতো করে রান্নাঘরের কড়িকাঠে ঝুলে গিয়েছিল হামিদা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে রান্নাঘরে গিয়ে হঠাৎ কেঁপে থমকে দাঁড়িয়েছিল কবীর।

ছোট শহরে বেশ সোরগোল পড়ে গেছল। থানা পুলিশের হাঙ্গামাও সামলাতে হয়েছিল। প্রথামতো পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে জানা গেছল, হামিদা ছিল চার মাসের পোয়াতি।

কে ছিল সে পুরুষ···কবীর এখনো জানে না। অনেক বিশ্বাসের চিহ্ন, অভিজ্ঞান—তার যৌবন কবে যেন ফুরিয়ে গেল। নিঃসম্বল কবীর তার শুকনো এবড়ো খেবড়ো দাড়িভরা গালে হাত দিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে, কেউ কি কোনোদিন ভরা গলায় তাকে ডাক দেবে না। কিছু খাদ্য আর পানীয় আর বিশ্রামের জন্য ····

দশটা বেজে গেছে। ফজল মিঞা জলিল মিঞা উঠে দাঁড়ালেন। একটু ঝুঁকে জলিল মিঞা মৃদু স্বরে কিছু বললেন। হয়ত খানিক আগের চমৎকার আলোচনার রেশ।

ওঁরা দু'জনে বেরিয়ে যান। শুধু বসির মিঞা বসে থাকেন।

বসির মিঞা ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের চোখে চোখ রাখেন।

ফিস ফিস করে ডাক্তার বলেন—তা হলে বলছ, কেলেঙ্কারিটা সত্যি হয়েছে?

—আর বল কেন, যৌবনের শেষ কামড়। বিড় বিড় করে বসির মিঞা বলে চলেন, তুমি আমাকে বাঁচাও ডাক্তার···। ব্যস্তভাবে ডাক্তারের হাত চেপে ধরেন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

উঠে গিয়ে কাচের আলমারীর মধ্য হতে একটি ওষুধের শিশি বের করে বসির মিঞার সামনে রাখেন ডাক্তার।

পরম নির্ভরতার সঙ্গে হাতের মধ্যে শিশিটা চেপে ধরেন বসির মিঞা। ঘোর লাগা গলায় তিনি জিজ্ঞেস করেন—তাহলে বলছ ডাক্তার, ভয় পাবার কিছু নেই?

—না হে না, অত ঘাবড়ালে চলবে কেন? কত কিছুই তো এই চল্লিশ বছরের ডাক্তারীতে পার করে দিলাম, তার ওপর তুমি আমার এক পেয়ালার ইয়ার। তাহলে শেষ পর্যন্ত ছোট ভাইয়ের বিধবা বউটা···চোখ মটকে অশ্লীলভাবে ইয়াসিন ডাক্তার হাসেন।

ঘাড় গুঁজে আশ্বাসের সমুদ্রে বিচরণ করেন বসির মিঞা।

প্রতি রাতের মতো ইয়াসিন ডাক্তার হাঁক দেন—কবীর···

তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে ভিতরকার একটি ঘরে চলে যায় কবীর। ফিরে আসে হাতে নিয়ে বিলেতী রঙীন জল। খাঁটি জিনিস ছাড়া ব্যবহার করেন না ইয়াসিন ডাক্তার। টলটলে পানীয় দুটি পাত্রে সমান ভাবে নির্দিষ্ট মাত্রায় সোডার সঙ্গে মিশিয়ে বসির মিঞা আর ডাক্তারের সামনে সাজিয়ে রেখে যায় কবীর। বেশ কয়েক বছর ধরে এরকমই চলছে।

তারপর নিজের জায়গাটিতে এসে বসে কবীর। প্রচ্ছন্ন অনাকার অন্ধকারে সে অনুভব করে তার সমস্ত পিতৃকোষ এক অভিশপ্ত কুয়াশার জটিল গোলক ঘাঁধায় হারিয়ে যাচ্ছে। বার বার চেষ্টা করেও পেছন ফিরে তাকাতে গিয়ে কোনো এক অস্থায়ী ঘরের ছবি ভেসে ওঠে না তার সামনে। ক্রমশ নিবিড় হয় নিঃসঙ্গতা মুহূর্তের পর মুহূর্ত চলে যায়। আধো ঘুম আধো চেতনায় কবীর স্বপ্ন দেখে ঘুল পাখি প্রজাপতির। সমস্ত দিক জুড়ে ছোট ছোট চারাগাছের বিরামহীন দোলা। রাশি রাশি শস্যের ঐশ্বর্যে অভিভূত কবীর অবিচল ধৈর্যে আশ্চর্যভাবে মাংসের গণ্ডীর বাইরে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। ঝাপসা কুয়াশায় হেঁটে যায় এক ছায়া-গড়া দেবশিশু।

এবং তখন সেই ব্যাধ তার অলৌকিক তূণ থেকে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে। পাতার ওপরে টুপটাপ করে শিশির জমে। আকাশে চাঁদের রঙ পাণ্ডুর হয়। এরকম বেঁচে থাকার ম্লান আয়োজন আরো হাস্যকর ও অর্থহীন মনে হয়।

ঠিক এগারোটার সময় এখান থেকে বাড়ি যাওয়ার ছুটি পাবে কবীর।

এখন কোন সমালোচনা, দলাদলি, আত্মকলহর সময় নয়। এখনও পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রাম ও গৃহ জলমগ্ন। হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়হীন। বন্যার গ্রাসে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। অনাহারে অনাশ্রয়ে এখনও অনেক মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। তারা আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন। তাদের আশ্রয় দিন। তাদের জন্যে আপনার সাহায্য পাঠান **মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণতহবিলে**।

মানুষের দুর্দিনে যে সব অসাধু ব্যবসায়ী দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি করছে, তাদের ক্ষমা করবেন না।

অন্যান্য বছরের ন্যায় পরবর্তী সংখ্যা **বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা** হয়ে বেরুবে। বিভিন্ন শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প সম্পর্কে স্পষ্ট আলোচনা করা হবে।

বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আমন্ত্রিত এবং মনোনীত অনেক লেখাই ছাপতে পারিনি। এজন্য পাঠক লেখক এবং শুভানুধ্যায়ীদের সহৃদয়তা প্রার্থনা করি।

যাত্রা,
নতুন দেশ,
নতুন মানুষের সান্নিধ্য
নয়তো বা ঘরে ফেরা
আনন্দময় দিন খুশীতে উজ্জ্বল হোক
যাত্রা হোক শুভ।

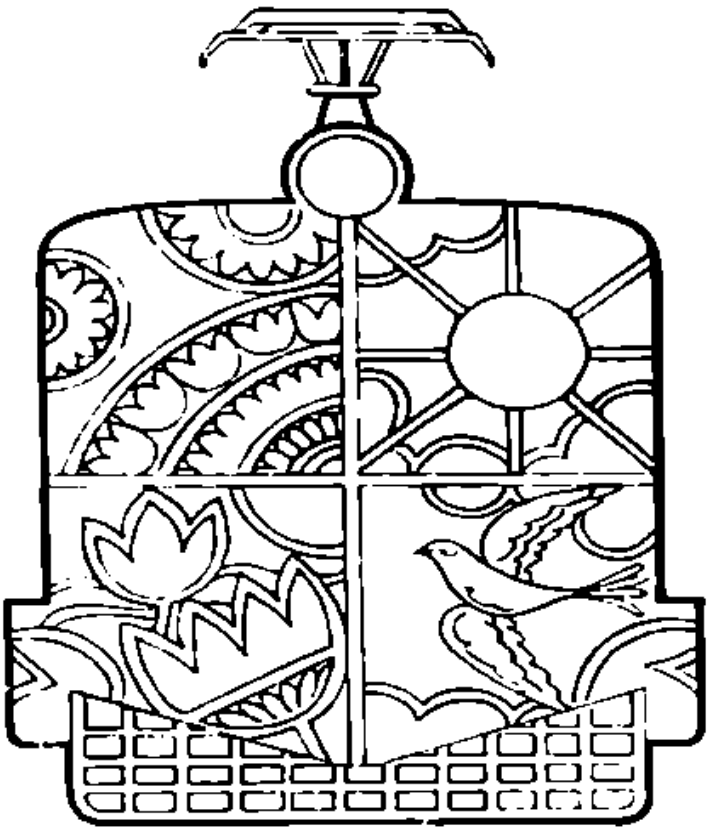

পূর্ব রেলওয়ে

গতিময় অভিযান

আকাশে রক্তের রং। বাতাসে লিউলীর সুবাস। মানুষের মন এখন শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে চঞ্চল। আজকের যে কোন সাধারণ নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়, শহর মানেই যান-বাহনের অভাব, শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের দু' ধারের চরম অব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতা।

ব্যাপক জনসংখ্যার বিপর্যস্ত কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সমস্যাকে পটভূমিকায় রেখেই ভূগর্ভ-রেলের ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা। ভূগর্ভ রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ গমনাগমন প্রতিশ্রুতি। ভূগর্ভ রেল মানেই জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক গতিময় অভিযান।

MJ

কলকাতার মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

With Best Compliments from :

CHANDA ADVERTISING

32, METCALFE STREET
CALCUTTA-700 013
Phone : 26-4253

With Best Compliments :

SHIV SHANKAR SAW MILL

2, HAZI BANKU LANE
KONNAGAR-712235
HOOGHLY (W.B.)

With best compliments from :

M/s. SAMANTA OIL STORES

50, STRAND ROAD,
CALCUTTA-7.
Phone : 33-1538

DEVELOPMENT CONSULTANTS

for comprehensive consultancy services in every field of engineering activity

For more than 25 years we have been providing technical consultancy services from start to finish. For every aspect of engineering, involving power generation and distribution, paper, fertiliser, cement, steel, other ferrous and non-ferrous metals, mining, material handling, textile, docks and harbours etc. involving architectural, structural, mechanical, electrical and project-development-construction-management-operation activities.

In the international field also, we are providing technical consultancy service in a big way-Thailand, Phillippines, Nepal, Syria, Egypt, Iraq, Kenya and Venezuela being some of the countries where we have already exported our service.

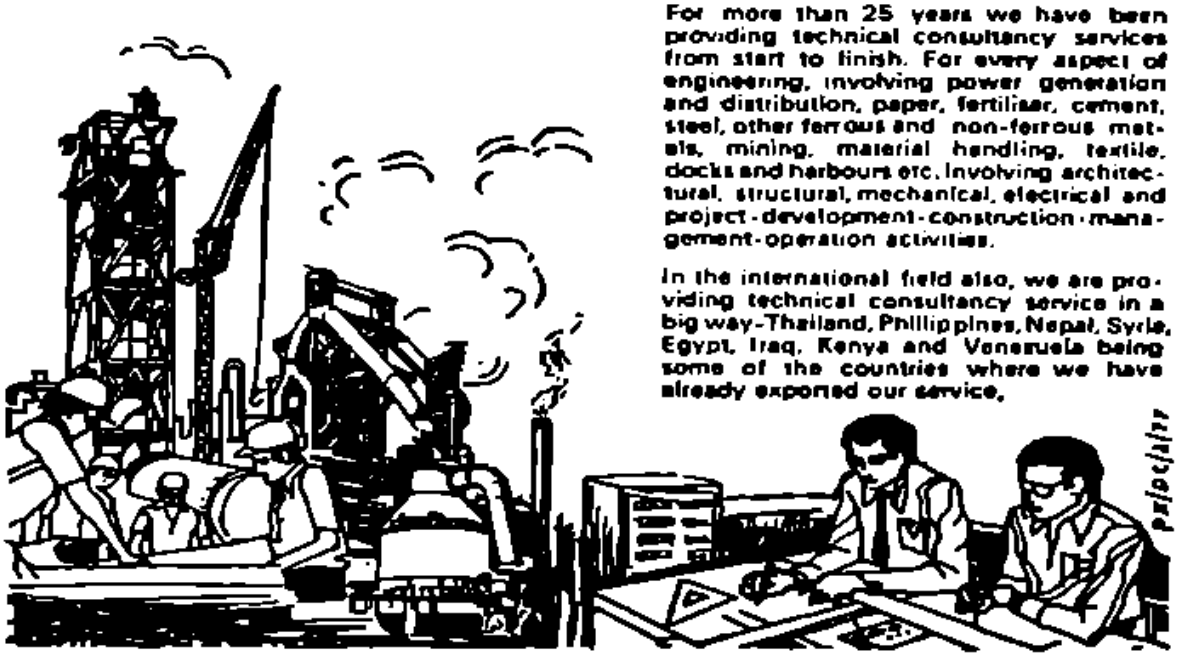

With best compliments from :

J. K. STEEL & INDUSTRIES LTD.

7, COUNCIL HOUSE STREET,
CALCUTTA-700 001

Gram : 'BALINGHOOP'
Phone : 23-6181 (7 lines)

- JUTE BALING HOOPS
- BOX STRAPPING
- COLD ROLLED STRIPS
- CABLE TAPES
- STEEL WIRE ROPES
- HIGH CARBON WIRES & STRANDS
- MILD STEEL WIRES
- ELECTRIC HOIST BLOCKS
- CHAIN PULLEY BLOCKS
- UNDERSLUNG CRANES
- E.O.T. CRANES
- JIB CRANES

মাঝারি ও বৃহৎ
শিল্প-উদ্যোক্তাদের জন্য

ডব্লু.বি.আই.ডি.সি.থেকে একাধারে একাধিক রকমের আকর্ষনীয় সুযোগসুবিধা—

প্রকল্প আইডেনটিফিকেশন এবং ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরী করা থেকে শুরু করে প্রকল্পের সার্বিক রূপায়ণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ডব্লু. বি. আই. ডি. সি. আপনাদের সহায়তা দিচ্ছে। এছাড়া, ডব্লু. বি. আই. ডি. সি দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নানাবিধ আকর্ষণীয় সুযোগসুবিধা ও সহজ শর্তে মেয়াদী ঋণ। আপনার প্রতিষ্ঠানের মেরামতি ভবনের ব্যাপারেও ডব্লু. বি. আই. ডি. সি অংশগ্রহণ করে।

আপনার প্রকল্পের জন্য যদি ১০ লক্ষ টাকার কম মূল্যের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন থাকে তাহলে যোগাযোগ করুন।

জনসংযোগে অধিকর্তা,
ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ
২৩৯, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোন : ২২-৮৩৮৫ (৩টি লাইন)

wbidc

ROYS ELECTRIC

GOVT. LICENSED CONTRACTOR
39/1/2B, CANAL WEST ROAD
CALCUTTA-700 004
Phone : 55-5505

* দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং ও কালিম্পং পার্বত্য বনাঞ্চলের অরণ্য সম্পদের সমৃদ্ধি সাধনে—
* বনজদ্রব্যভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে—
* উত্তরবঙ্গের অনুন্নত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে—

একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন করপোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-৭০০০১৩

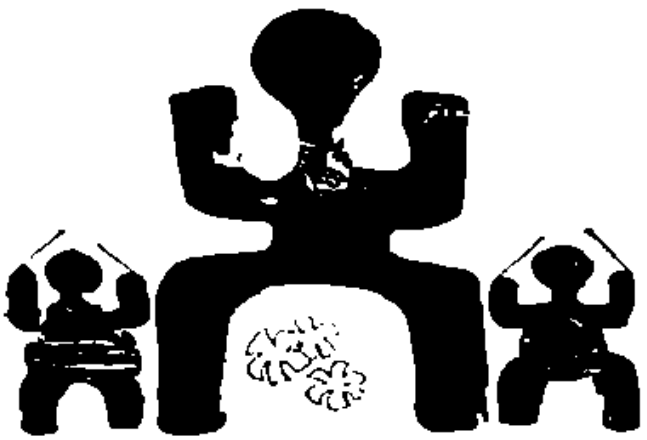

যাত্রা শুভ হোক

আকাশে শরতের হালকা মেঘের আনাগোনা শুরু হতেই ঘরের মানুষের কাছে সমুদ্র-পর্বতের ডাক এসে যায়। বাইরের মানুষের কাছে ঘরে ফেরার হাতছানি দুর্বার হয়ে ওঠে। মন তখন সত্যিই মেঘের সঙ্গী হতে চায়।

অগণিত মানুষের প্রাণোচ্ছল পথচলার নিত্যসঙ্গী আমরাও।

দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে

আপনাদের সেবায়

যোগমায়া মার্কেট

৩৪, বিধান সরণী

(বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)

কলকাতা-৬

সৌজন্যে

কুণ্ডু ব্রাদার্স

(কাগজ বিক্রেতা)

৬৫/৬৬, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট

কলকাতা-১

ফোন : 26-0557

Reg. No BANGLA CHHOTOGALPO
R N. 30071/76 October-December 1978 Rs. 2-00

ছোটগল্প গ্রন্থমালা
সিরিজের বই
নিয়মিত বেরুচ্ছে
প্রতিখণ্ডের দাম দু'টাকা

বেরিয়েছে

অমিয় রায়চৌধুরীর গল্প

কালীকুমার চক্রবর্তীর গল্প

বেরুচ্ছে

স্বদেশরঞ্জন দত্তর গল্প

পরবর্তী গ্রন্থের নাম ক্রমান্বয়ে ঘোষণা করা হবে

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলকাতা-১২

বাংলা ছোটগল্প প্রকাশনী
১৮, পদ্মপুকুর রোড কলকাতা-২০

স্বদেশরঞ্জন দত্ত কর্তৃক ১৮ পদ্মপুকুর রোড কলিকাতা ২০ হইতে প্রকাশিত ও মণিকো প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৪, দুর্গাবাড়ী রোড কলিকাতা ২৮ হইতে মুদ্রিত।